ফেব্রুয়ারি ২০২০ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৬

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা

অর্পিতা রায় বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

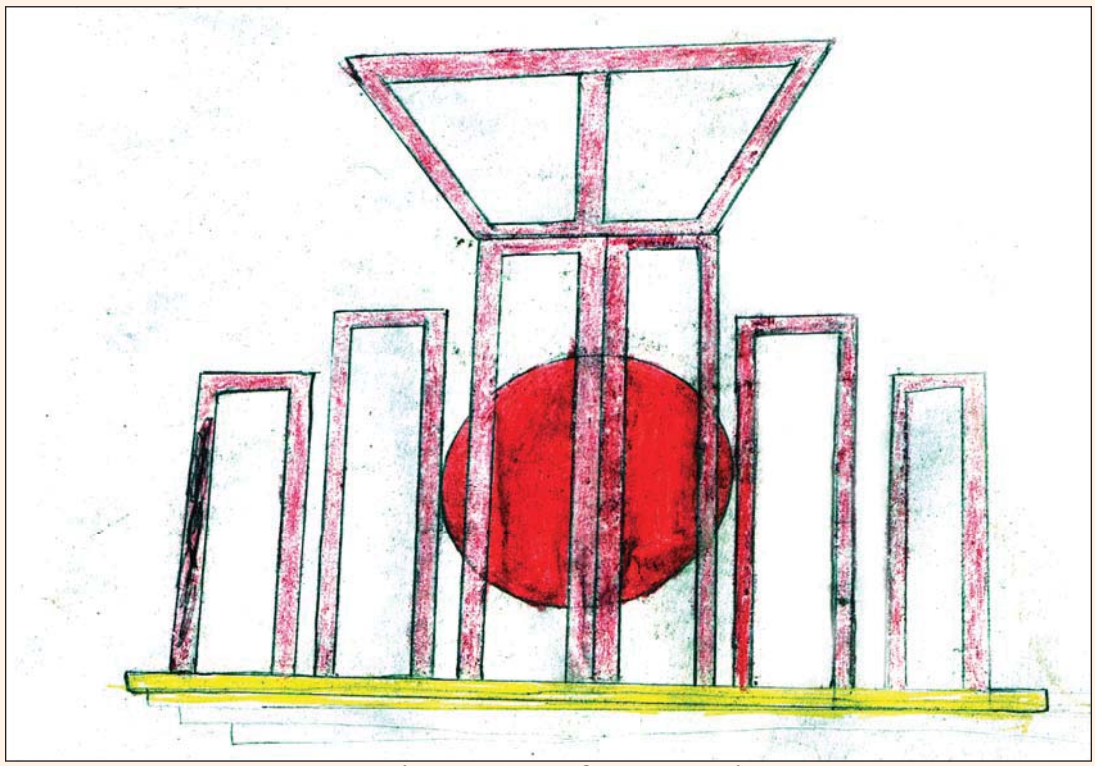

মো. আব্দুল্লাহ আল মুইয্য, নার্সারি শ্রেণি, আল কারীম কিন্ডার গার্টেন, আশুলিয়া, সভার, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

ফেব্রুয়ারি ২০২০ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৬

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি’।

রক্তে রাঙা ফেব্রুয়ারি, ভাষা আন্দোলনের মাস। ১৯৫২ সালের এই দিনটিতে কি ঘটেছিল, তা নিশ্চয়ই তোমরা জানো বন্ধুরা। বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যে বাংলা ভাষাকে ঘিরে সেই ভাষার ওপর আঘাত করেছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। বায়ান্নতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি শুধুমাত্র বাংলার মানুষের মুখে মুখেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্রমান্বয়ে পূর্ব বাংলার সব শহরে ভাষার দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য এ মাস এলেই মনে পড়ে যায় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ আরো অনেক ভাষা শহিদদের কথা, যাঁরা ভাষা আন্দোলনে শহিদ হয়েছিলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির এই দিনটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, পালিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। প্রতিবছরই ফেব্রুয়ারি মাসজুড়েই থাকে নানা আয়োজন। একুশের বইমেলা এই আয়োজনে নিয়ে আসে ভিন্ন মাত্রা।

ফেব্রুয়ারি এলেই শুরু হয় প্রাণের মেলা ‘একুশের বইমেলা’। বইমেলার নতুন নতুন বই পড়ার আনন্দই আলাদা তাই না ছোট্ট বন্ধুরা? আমি তো খুব খুশি। তোমরাও তো খুশি বন্ধুরা! ভালো থেকো সকলে। সবার জন্য শুভ কামনা রইল।

সূচি

নিবন্ধ

০৪ একুশ আমার গর্ব, একুশ আমার অহংকার
০৫ বঙ্গবন্ধুর ভাষা ও সাহিত্য চিন্তা/ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
১৪ ভিনদেশের শহিদমিনার/হামিদ রিপন
১৮ শিশু-কিশোরদের ভাবনায় বইমেলা/রুমান হাফিজ
২৪ বাংলা ফন্ট চালু করল জাতিসংঘ/ইশরাত জাহান
৩০ আমার বর্ণমালা, আমার অহংকার
৩৪ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় শিশুরা/সাবিনা ইয়াসমিন
৩৬ বই নিয়ে মজার তথ্য/শাহানা আফরোজ
৩৭ স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনা/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫২ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৫৩ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ/ মেজবাউল হক
৫৪ সোনামণিদের সুন্দর হাসি/অনিক শুভ
৫৬ বন কাগজ/প্রসেনজিৎ কুমার দে
৫৮ বাজরা/ মো. জামাল উদ্দিন
৬০ সাইকেলে স্বপ্ন নভেরার/জান্নাতে রোজী
৬২ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

বিজ্ঞান

৪৪ আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সানাউল্লাহ আল-মুবীন

ভাষা দাদু

২০ স্বরধ্বনি তাহলে ১১টি নয়!/তারিক মনজুর

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবি

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান খালি পায়ে মহান শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪

গল্প

১২ শহিদমিনার/আঞ্জুমন আরা
১৬ পলাশ শিমুল/হামীম রায়হান
২৩ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের গল্প/ মুহাম্মদ ইসমাঈল
২৫ আমরা করব জয়/নাসিম সুলতানা
২৭ ডাব্বু/জাকির হোসেন কামাল
৩৮ অটোগ্রাফের গল্প/বিএম বরকতউল্লাহ্
৪০ দাদুর উপদেশ/বাসু দেবনাথ
৪২ বায়োলজি স্যারের মজার ক্লাশ/আব্দুর রহমান

কবিতা

১০ আরিফুল ইসলাম সাকিব/রানা আহম্মেদ
১১ নিহাল খান/তারিকুল ইসলাম সুমন/রমজান আলী রনি
১৩ ইরিনা হক
১৭ মো. তাসিন হোসেন/তাসনিম সুহিনা
২২ আহমেদ টিকু
৩২ গোপেশচন্দ্র সূত্রধর/শাহাদাৎ শাহেদ
৩৩ ছাদির হুসাইন ছাদি/রফিকুল ইসলাম
৩৫ আল আমীন হুসাইন/তানজিনা আক্তার

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: অর্পিতা রায় বর্মন, মো. আব্দুল্লাহ আল মুইয়্য
শেষ প্রচ্ছদ: লিলিয়ান ত্রিপুরা
২৬ মো. শাহিদী হাসিব
২৯ তাসনোভা প্রিয়ন্তি
৪৩ এস এম রেহাম রামিন
৫১ আবু সুফিয়ান লিখন
৬১ তাসিন মুমস্বাদ
৬৪ মো. ফারজান আজাদ/ মো. সাজিদ হোসেন

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

প্রথম শহিদমিনার, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

একুশ মানে মাথা নত না করা
একুশ মানে মায়ের ভাষায় স্বাধীন কথা বলা

একুশ আমার গর্ব
একুশ আমার অহংকার

প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান, ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সীমারেখা নির্ধারণের চেয়েও অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, পাকিস্তানের দুটি অংশ এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়ে যে, একটি অংশের সাথে অপরটির দূরত্ব প্রায় দুই হাজার মাইল! সেই সাথে ভাষাও ভিন্ন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করে। পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তার পরপরই গণপরিষদে প্রস্তাবটির তুমুল বিরোধিতা শুরু হয়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দমে না গিয়ে তিনবার বিভিন্ন সংশোধনী সহ বিলটি পুনরায় উত্থাপন করেন কিন্তু প্রতিবারই প্রস্তাবটি একই ভাগ্যবরণ করে। অবশেষে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ গণপরিষদে রাষ্ট্রভাষা উর্দু বিল পাস হলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরোধ দিবস ও বিক্ষোভ ধর্মঘট পালিত হয়। প্রতিরোধ মিছিল থেকে শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদসহ ৬৮ জন ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। এরপর রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি আরো জোরালো হয়। ২১শে মার্চ ও ২৪শে মার্চ যথাক্রমে রেসকোর্স ময়দানে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, উপস্থিত ছাত্রজনতা ঘৃণা ভরে 'না না' কণ্ঠে তা প্রত্যাখ্যান করে। পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সহ বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন। এদিকে ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানের জনসভায় পুনরায় উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা করেন। ক্ষোভে ফেটে পড়া ছাত্ররা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। কিন্তু ১৮ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ই ফাল্গুন ১৩৫৮) এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী মিলে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত ও আব্দুল জব্বারসহ আরও অনেকে। শহিদদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনায় পূর্ব বাংলায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে প্রথম শহিদমিনার, যা ২৪শে ফেব্রুয়ারি উদ্‌বোধন করেন শহিদ শফিউর রহমানের বাবা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদমিনারের উদ্‌বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রবর্তিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা এবং কৃষ্টির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এখন সারা বিশ্ব গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতি বছর এ দিবসটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে। ■

সূত্র : বাংলাপিডিয়া

মাতৃভাষার জন্য আত্মোৎসর্গকারী শহিদদের স্মরণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মোনাজাত ও শোভাযাত্রা। দ্বিতীয় সারিতে মোনাজাতরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

বঙ্গবন্ধুর ভাষা ও সাহিত্য চিন্তা

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বব্যাপী একজন মুক্তিসংগ্রামী এবং মহান রাজনীতিবিদ হিসেবেই পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবেই তিনি রাজনীতির মানুষ–রাজনীতিই তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। তিনিই বাঙালির শ্রেষ্ঠতম নেতা। বাঙালির সম্মিলিত চেতনায় জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে তিনি পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। গণতান্ত্রিক মূল্যচেতনা এবং অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা–এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্যই বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদের মূলকথা। শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। এই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন বাঙালির চেতনায়।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থেই অভিন্ন ও একাত্ম। বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে অনিবার্যভাবে এসে যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। জনগণের

স্বার্থের সঙ্গে, দেশের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে তিনি একাত্ম করতে পেরেছেন। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়–দেশের স্বার্থের কাছে, জনগণের স্বার্থের কাছে তিনি জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন নিজের স্বার্থ। বিশ্ব-ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো জাতীয়তাবাদী নেতার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনিই একমাত্র নেতা, যিনি জাতীয় পুঁজির আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা ও বাঙালির সম্মিলিত মুক্তির বাসনাকে এক বিন্দুতে মেলাতে পেরেছেন। বিশ্ব-ইতিহাসে কোনো জাতীয়তাবাদী নেতার কর্মসাধনায় আমরা এই যুগল স্রোতের মিলন লক্ষ করি না।

শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শোষিত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে তিনি কখনো দূরে সরে যাননি, ভীতি ও অত্যাচারের মুখেও সর্বদা তিনি সত্যের কথা বলেছেন, শোষিত মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর এই অবস্থানের কারণে তিনি শুধু বাংলাদেশেরই নয়, বিশ্ব মানুষেরই অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন–এসব সংস্থায় শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে।

দুই

সূচনা সূত্রেই ব্যক্ত হয়েছে যে রাজনৈতিক সত্তাই বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। তবে শুধু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তিই নয়, বাংলাদেশের ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মুক্তিসংগ্রামেও অন্যতম নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বস্তুত তাঁর সাধনার মধ্য দিয়েই ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি রচিত হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়ও তিনি পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন ভাষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।

রাজনীতির মানুষ হয়েও রাজনীতির বাইরেও নানা বিষয় নিয়ে ভেবেছেন বঙ্গবন্ধু—খেলাধুলা, চলচ্চিত্র, ভাষা, সাহিত্য, সংগীত–কোনো কিছুই তাঁর চিন্তার বাইরে ছিল না। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২), 'কারাগারের রোজনামচা' (২০১৭) এবং 'আমার দেখা নয়াচীন' (২০২০) প্রকাশের পর তাঁকে একজন লেখক হিসেবে চিনে নেওয়ারও ঐতিহাসিক সুযোগ ঘটেছে বিশ্ববাসীর। তবে এতসব বিষয় নয়, আজকের এ লেখায় বঙ্গবন্ধুর ভাষা ও সাহিত্য চিন্তা সম্পর্কেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য–সব কিছুর প্রতিই ছিল বঙ্গবন্ধুর গভীর ভালোবাসা। বাংলার ভাষাসাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার একটা নির্যাস পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে দেওয়া তাঁর ভাষণ থেকে। ওই ভাষণের নিম্নোক্ত অংশ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ধারণার একটা সুস্পষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়েছে–

'আমরা বাঙালি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমি যদি ভুলে যাই আমি বাঙালি, সেদিন আমি শেষ হয়ে যাবো। আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলার মাটি আমার প্রাণের মাটি, বাংলার মাটিতে আমি মরবো। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা। *[ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পাদক), বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (ঢাকা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ২০১২), পৃ. ১১৪]*

বাংলা ভাষার উন্নতি ও বিকাশের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ও চিন্তা বিভিন্ন ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি। বাংলা ভাষার উন্নতি ও বিকাশের জন্য বঙ্গবন্ধু সবসময় সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রেরণা দিয়েছেন–তাঁদের নির্ভয়ে কাজ করার সাহস জুগিয়েছেন। (আতিউর রহমান, বঙ্গবন্ধুর নান্দনিক ভাবনা, প্রকাশ-তথ্য অনুক্ত, পৃ. ১৩) ভাষা যে নদীস্রোতের মতো প্রবাহমান, বঙ্গবন্ধু তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছেন। কখনো কখনো এসব প্রসঙ্গে একজন ভাষাতাত্ত্বিকের মতোই বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেছেন তাঁর ভাবনা। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, ১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের

স্বাধীন বাংলাদেশের একুশের প্রথম প্রহরে জাতির পক্ষ থেকে মহান ভাষা শহিদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। সে ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা : ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১) উদ্ধৃত অংশ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য বঙ্গবন্ধুর আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষার কথা সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

বাঙালির অহংকার আর গৌরবের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও চিন্তক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রথমদিন থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ছিলেন গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর এই সম্পৃক্তি বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' বঙ্গবন্ধু তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি। নাজিমুদ্দিনের

ঘোষণায় ভাষা আন্দালন নতুন করে চাঙা হয়ে ওঠে। জেলে থেকেই গোপনে বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলনের দিকনির্দেশনা দিতে থাকেন, যোগাযোগ গড়ে তোলেন আন্দোলনের সংগঠকদের সঙ্গে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের উদ্দেশ্যে অসুস্থতার কথা বলে ভর্তি হন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বঙ্গবন্ধুর নিজের ভাষ্য থেকেই জানা যায় ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্তির কথা–'আমি তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বন্দি অবস্থায় চিকিৎসাধীন। সেখানেই আমরা স্থির করি যে, রাষ্ট্রভাষার উপর ও আমার দেশের উপর যে আঘাত হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তার মোকাবেলা করতে হবে। সেখানেই গোপন বৈঠকে সব স্থির হয়।... কথা হয়, ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমি জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট করব, আর ২১ তারিখে আন্দোলন শুরু হবে। জেলে দেখা হয় বরিশালের মহিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে। তাঁকে বললাম, আমরা এই প্রোগ্রাম নিয়েছি। তিনি বললেন, আমিও অনশন ধর্মঘট করবো। ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমরা অনশন ধর্মঘট করলাম। এর দরুন আমাদের ট্রান্সফার করা হলো ফরিদপুর জেলে। সূচনা হয় ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের। (মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২)'

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। ভাষার প্রতি ভালোবাসা ছিল বলেই বন্দি জীবনেও তিনি পালন করেছেন দুঃসাহসিক ভূমিকা। হাসপাতালে বসেই তিনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, দিয়েছেন প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমি হাসপাতালে আছি। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে। ... আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম। আরও বললাম, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহাবুব আরও কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে খবর দিতে। ... আরও দু'একজন ছাত্রলীগ নেতাকে আসতে বললাম। শওকত মিয়া ও কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকেও দেখা করতে বললাম। পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে। আরও বললাম, 'আমিও আমার মুক্তির দাবি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব।'(শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃ. ১৯৬-১৯৭)

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর প্রাতিস্বিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। সব মানুষই মাতৃভাষাকে ভালোবাসে। প্রসঙ্গত এক জায়গায় তিনি লিখেছেন– যে কোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালোবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোনোকালে সহ্য করে নাই। (পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯) এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁর মধ্যে কোনো সংকীর্ণ ভাষা-চিন্তার জন্ম দিতে পারেনি। উদার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি সকল ভাষার প্রতিই তাঁর ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। পাকিস্তানের বৃহত্তর বাস্তবতায় বাংলার

আমরা বাঙালি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমি যদি ভুলে যাই আমি বাঙালি, সেদিন আমি শেষ হয়ে যাবো। আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলার মাটি, আমার প্রাণের মাটি, বাংলার মাটিতে আমি মরবো, বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা।

পাশাপাশি উর্দুসহ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাকে স্বীকৃতির পক্ষে তিনি সুস্পষ্ট মত দিয়েছেন। (আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, 'বঙ্গবন্ধুর ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতিচিন্তা', দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১১) অথচ বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধ আচরণের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচলিত ভাষার তিনি বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতেন। এ বিষয়ে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি ব্যক্ত করেছেন এই সুস্পষ্ট অভিমত,

'বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তাই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। তবুও আমরা বাংলা ও উর্দু দুইটা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলাম। পাঞ্জাবের লোকেরা পাঞ্জাবি ভাষা বলে, সিন্ধুর লোকেরা সিন্ধি ভাষায় কথা বলে, সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা পশতু ভাষায় কথা বলে, বেলুচরা বেলুচি ভাষায় কথা বলে। উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, তবুও যদি পশ্চিম পাকিস্তানের ভায়েরা উর্দু ভাষার জন্য দাবি করে, আমরা আপত্তি করব কেন?(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮)

বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতে ভালোবাসতেন– বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা থেকেই তিনি বাংলায় বক্তৃতা করতেন। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে বেইজিং-এ আয়োজিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিদের শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু অংশগ্রহণ করেন। আমাদের অনেকেরই অজানা যে, শান্তি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন, যা ইংরেজি, চীনা, রুশ ও স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করে উপস্থিত প্রতিনিধিদের শোনানো হয়। এ প্রসঙ্গে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তান থেকে আতাউর রহমান খান ও আমি বক্তৃতা করলাম। আমি বাংলায় বক্তৃতা করলাম। আতাউর রহমান সাহেব ইংরেজি করে দিলেন। ...কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না? ভারত থেকে মনোজ বসু বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন, দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও আমি খুব কম দেখেছি। আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য।'(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২২৮) পরবর্তীতে, ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনেও বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেছেন।

শুধু বক্তৃতা-বিবৃতি-ভাষণেই নয়, আইনসভায়ও বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার পক্ষে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন সাহসী ভূমিকা। ১৯৫৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো ছাড়াও তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ চান। স্পিকার ওহাব খান পশতু ভাষা না-জানা সত্ত্বেও একজন সদস্যকে ওই ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করার সুযোগ চান। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ না দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ বঙ্গবন্ধু প্রতিবাদ জানান, অন্যান্য সদস্য নিয়ে ওয়াক আউটের হুমকি দেন।

তিন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মর্মে মর্মে রাজনীতিবিদ হয়েও ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তা ভাবলে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। তিনি ছিলেন রাজনীতির কবি-Poet of Politics. মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মধ্যবিত্তের শহুরে ভাষার পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছেন লোকভাষা। তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় লোকভাষা-আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বিস্ময়কর সার্থকতা লক্ষ করা যায়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি। বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক মানবিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন–তাঁর ভাষা ও সাহিত্য চিন্তা সে স্বপ্নেরই সমার্থক এক অনুষঙ্গ। ■

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমার বাংলা ভাষা

আরিফুল ইসলাম সাকিব

কৃষক, তাঁতি, শ্রমিক, চাষা
সবার মুখের সহজ ভাষা
বাংলা ভাষার মায়া,
যাক ভুলে যাক সবই তবে
বাংলা ভাষা মিশেই রবে
দেহের যেমন ছায়া।

তেজে ভরা সাহস ছিল
জীবন বাজির শপথ নিল
বিজয়েরই পাতা,
রফিক, শফিক আরো যারা
চির অমর হলেন তাঁরা
ইতিহাসে গাথা।

স্বাধীন দেশের আমজনতা
হাসি মুখে বলবে কথা
বাংলা সবার প্রাণে,
রম্য-রসিক মুখের হাসি
বাংলা তোমায় ভালোবাসি
বাংলা আমার গানে।

রক্তে মাখা ফেব্রুয়ারি

রানা আহম্মেদ

যে ভাষা জন্ম না নিলে
সূর্য উঠত না পূর্বে এ বাংলায়,
যে ভাষা জন্ম না নিলে
সূর্যটা আর ডুবত না সন্ধ্যায়।।

যে ভাষা আছে বলে
আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলা,
যে ভাষা আছে বলে
আমরা পেয়েছি মায়ের বুলির ঘ্রাণ।

সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত গেয়ে যায় এক গান
বাংলা আমার মায়ের ভাষা বাংলা আমার প্রাণ,
গোধূলির রাঙা আগুন সন্ধ্যা শোনায় রাতকে গান
বাংলা আমার মায়ের ভাষা বাংলা যে আমার প্রাণ।

মাগো মোরা ভুলিনি আজও ঐ দিনটির কথা
রক্তে যেদিন রাজপথ হয়েছিল যে সবটাই রাঙা,
সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার লাশের ঐ ব্যথা
মাগো মোরা ভুলিনি আজও ঐ দিনটির কথা।

একুশ

নিহাল খান

একুশ মানে বাংলা ভাষা
একুশ আমার অহংকার
একুশ মানে শত আশা
একুশ মুক্তির দ্বার ।
একুশ তো নয় পরাধীনতা
একুশ মানে স্বাধীন
একুশ তো নয় নীচ-হীনতা
একুশ মুক্তির দিন।
একুশ মানে রাষ্ট্রভাষা
মাতৃভাষা বাংলা
একুশ হলো ভোরের ফুল
শহিদবেদির মালা।

ভাষার কথা

তারিকুল ইসলাম সুমন

একটা গাছে নানান পাখির
কাটত ভালো খুব,
সময় পেলেই গল্প-গানে
সবাই দিত ডুব।

সব পাখিদের শীতল পরান
মাকে যখন ডাকে,
ছা পাখিতে পাঠশালাতে
মায়ের ভাষায় হাঁকে।

হঠাৎ এসে বাজপাখি এক
ভাষায় দিলো হানা,
তার ভাষাতে বলবে কথা
অন্য ভাষায় মানা!

প্রতিবাদের উঠল জোয়ার
এমনকি আর হয়?
আঘাত এল; জীবন গেল
ভাষা ছাড়ার নয়।

রক্তে ভিজে জমিনটা লাল
ঝরল তাজা প্রাণ,
ওই ভাষাটি সবার এখন
অ-আ-য় লেখা গান।

যুদ্ধলিপি

রমজান আলী রনি

দেশটা যদি গিলে ফেলে
শেয়াল, শকুন মিলে
সোনালি ধান সবুজ শস্য
খেয়ে যাবে চিলে।

অকুতোভয় সংগ্রামী পণ
যুদ্ধলিপি আঁকে
ভাষার ত্যাগে একটি গোলাপ
মা, মা বলে ডাকে।

রক্ত কপাট অশ্রু আঁখি
টগবগিয়ে ফোটে
শিকল ভেঙে মাতৃভাষা
মায়ের হাসি ঠোঁটে।

হৃৎপিণ্ডটা টিকটিক করে
ঘড়ির মতো বাজে
সময় হলো বরণ করার
শহিদ সকল আজে।

গল্প

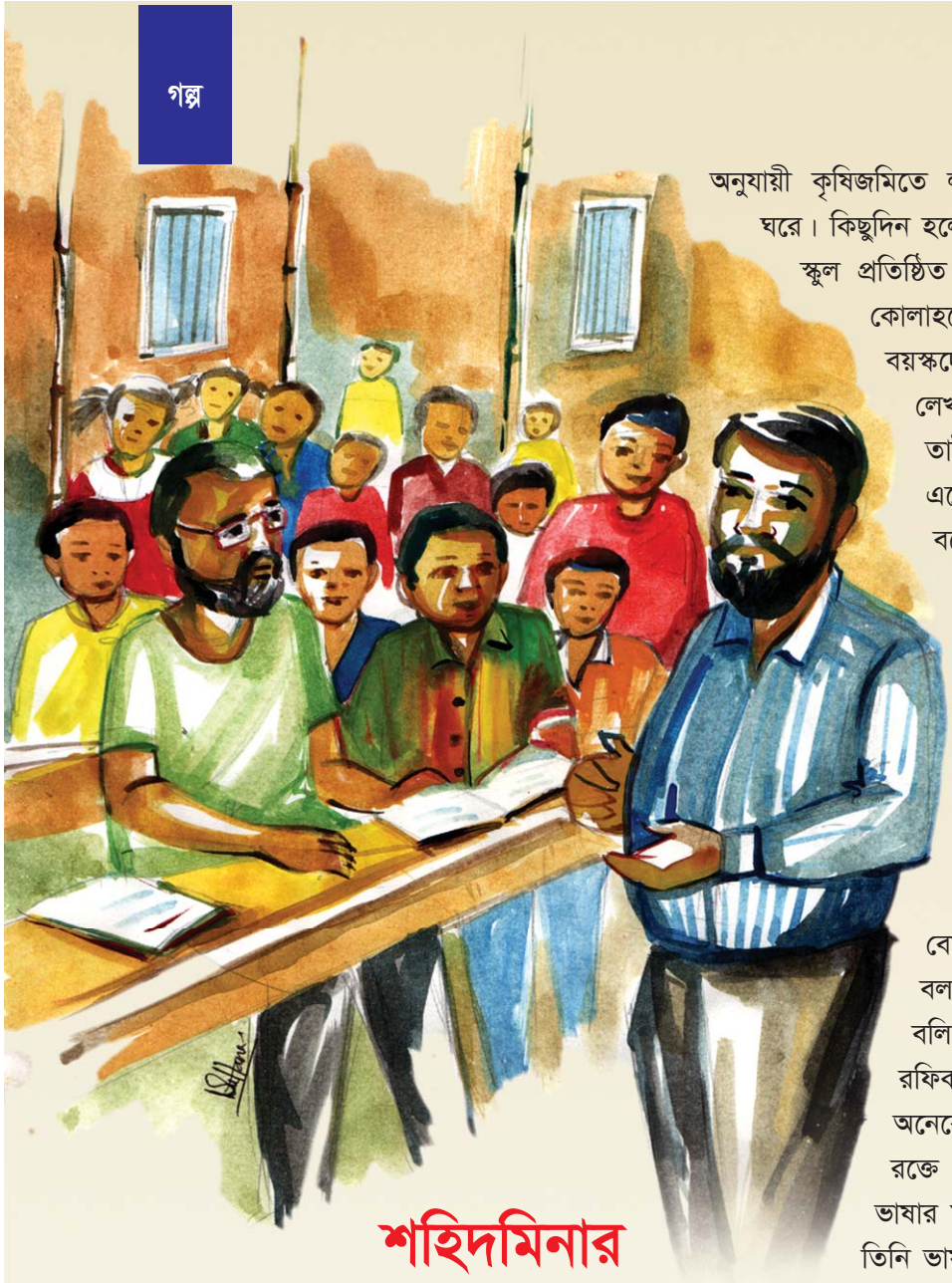

শহিদমিনার

আঞ্জুমন আরা

সমুদ্র তীরবর্তী চরাঞ্চলের ছোট্ট একটি গ্রাম। এখানে তখনো শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। এই গাঁয়ের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি ও মাছ ধরা। এখানকার অধিবাসীদের চাঁদ, সূর্য ও জোয়ারভাটার সাথে মিতালি। আবহাওয়ার খবর শুনে তারা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। বাংলা মাসের হিসাব অনুযায়ী কৃষিজমিতে লাঙল দেয়। ফসল তোলে ঘরে। কিছুদিন হলো এখানে একটি এনজিও-র স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিকেলে শিশুদের কোলাহলে মুখরিত হয় এই প্রতিষ্ঠান। বয়স্কদেরও বোঝানো হয়েছে লেখাপড়ার কোনো বয়স নেই। তাই তাদের মধ্যে অনেকেই এসেছে অক্ষরজ্ঞান লাভ করতে। বয়োবৃদ্ধ রহিমুদ্দীন চাচাও এসেছেন অক্ষরজ্ঞান নিতে। তিনি নিরক্ষর বয়স্ক হলেও বেশ জ্ঞানী। শিক্ষকগণ শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মকানুন, গান, ছড়া, ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেন। সেদিন ক্লাসে একুশে ফেব্রুয়ারি কী তা বোঝালেন শিক্ষক। তিনি আরো বললেন আমরা যে ভাষায় কথা বলি সেই ভাষার জন্য প্রাণ দিলেন রফিক, শফিক, জব্বারসহ আরো অনেকে। বাংলার ছাত্র যুবকদের রক্তে রঞ্জিত হলো রাজপথ। এই ভাষার মান আমাদের রাখতে হবে। তিনি ভাষা শহিদদের কথা ও ভাষার মর্যাদার কথা বললেন, আর শিক্ষার্থীদের নিয়ে গাইতে শুরু করলেন –

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি।

রহিমুদ্দীন চাচা ক্লাসে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তার কান্না শুনে শিক্ষক কারণ জানতে চাইলেন। চোখ মুছতে মুছতে তিনি বলে উঠলেন –

পেটের ক্ষুধারে প্রাধান্য দিতে গিয়া কেমনে টাকা

কামাই করতে হয় সেই পথ খুঁজছি। অথচ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যে ভাষায় কথা বলছি তার জন্য যে-সব ছাত্র, যুবক জীবন দিল তা কখনো জানা হয় নাই। রেডিওতে এই গান কত হুনছি, তয় বুঝি নাই কি কয়। আমি কতটা মূর্খ হয়ে জীবনযাপন করলাম। আজ আপনার কাছে সব শুনে মনে হলো একবার যদি সেই সব বীর শহিদ ভাইদের দেখা পাইতাম তাহলে স্যালুট করতাম।

শিক্ষক বললেন, এখনো আমরা তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। আপনিও করতে পারবেন চাচা।

কীভাবে? কই পাইমু তাগোরে।

শহিদমিনারে।

ওইডা আবার কী?

এবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা শহিদমিনার বানাব তারপর তাতে ফুল দিয়ে শহিদ ভাইদের স্মরণ করব। আর এই গানটি গাইব। এভাবেই তো তাদের শ্রদ্ধা জানানো হবে।

কন কী? শহিদমিনারে ফুল দিলে শহিদ ভাইদের সম্মান করা হয়? তাহলে এবার আমি নিজ হাতে শহিদমিনার বানামু। বাচ্চারা তোমরা আমার সাথে থাকবা না?

সবাই সমস্বরে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল ...

জি, থাকব ...।

পরদিন থেকে শহিদমিনার বানানোর কাজে মন দিলেন রহিমুদ্দীন চাচা। শিক্ষক তাকে নকশা দেখিয়ে দিলেন। আর ছাত্ররা তাকে সাহায্য করল। একুশে ফেব্রুয়ারি এলে সবার আগে খালি পায়ে রহিমুদ্দীন চাচা শহিদমিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন। তারপর শিক্ষক, ছাত্ররা ও সাধারণ জনতা। একটি অনগ্রসর এলাকায় নতুন করে পরিচিতি লাভ করল একুশে ফেব্রুয়ারি। আর সেই থেকে শুরু হলো ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এভাবেই বাংলা ভাষার জন্য গর্বিত হতে শিখে গেল তারা। ■

একুশ মানেই

ইরিনা হক

একুশ মানেই আমার মা
একুশ মানেই মায়ের মুখের ভাষা
একুশ মানেই সালাম বরকত রফিকের
ভাষার তরে জীবন দেওয়া,
একুশ মানেই শহিদমিনার
শহিদবেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো,
একুশ মানেই নতুন করে পথ চলা
একুশ মানেই বইমেলা
মেলায় গিয়ে নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নেওয়া,
একুশ মানেই চিন্তার স্বাধীনতা
নতুন কবিতা, গান আর সাহিত্য,
একুশ মানেই স্বাধীন দেশ
স্বাধীন দেশে মাথা উঁচু করে বাঁচা,
একুশ মানেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ
সোনার বাংলা গড়ে তোলার দীপ্ত প্রয়াস।

নিবন্ধ

ভিনদেশের শহিদমিনার

হামিদ রিপন

শহিদমিনার হলো ভাষা আন্দোলনের শহিদ এবং শহিদ দিবসের স্মৃতিরক্ষক স্থাপত্য। এ মিনার কেবল শিল্পীর নির্মিত কোনো ভাস্কর্য মাত্র নয়; বরং এটি বাংলাভাষী মানুষের চেতনার প্রতীক, বাঙালির সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনে এক প্রাণবন্ত সত্তা ও প্রেরণার উৎস।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে নির্মিত শহিদ মিনার ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের হোস্টেলবাসী শিক্ষার্থীদের এক রাতের শ্রমে তৈরি হয়েছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারি সেটি ভেঙে ফেলা হয় তৎকালীন সরকারের নির্দেশে। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেবার পরে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এর নকশা করেছিলেন ভাস্কর হামিদুজ্জামান। নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৬৩ সালের শুরুতে। ঐ বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম নতুন শহিদমিনার উদ্‌বোধন করেন ।

আড়াই দিনের আয়ু দিয়ে বিলুপ্ত শহিদমিনার কালের বিবর্তনে মানুষের প্রাণের মিনার হয়ে ওঠে। বায়ান্ন সালেই আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে একাধিক শহরে গড়ে তোলা হয় শহিদমিনার। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের প্রকাশ ঘটিয়ে ১৯৫৩ সাল থেকে শহিদ দিবস পালন উপলক্ষ্যে দেশের সর্বত্র তৈরি হতে থাকে ছোটো-বড়ো শহিদমিনার। শহিদমিনারে ভোরে খালি পায়ে প্রভাতফেরি, কণ্ঠে একুশের গান আর ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় ভাষা শহিদদের।

দীর্ঘ ৪৭ বছর পর ১৯৯৯ সালে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলামের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় জাতিসংঘের

সাধারণ সভায়। দিনটিকে স্বীকৃতি দিতে ১৮৮টি দেশ নীতিগত সমর্থন জানায়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২১শে ফেব্রুয়ারি গৃহীত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। জাতীয় পরিসর থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পালিত হতে থাকে দিনটি। এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নির্মাণ করা হয় শহিদমিনার। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে শহিদমিনার এখন ঠাঁই করে নিয়েছে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কানাডা, প্যারিসসহ পৃথিবীর অনেক দেশে।

যুক্তরাজ্যে শহিদমিনার

বাংলাদেশের বাইরে প্রথম শহিদমিনার স্থাপিত হয় লন্ডনে। গ্রেট মেনচেস্টারের ওল্ডহ্যামের ওয়েস্টহুড নেবারহুডে তৈরি হয়েছে এ শহিদমিনার। ১৯৯৭ সালের ৫ই অক্টোবর এই শহিদমিনার নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে লন্ডনে নির্মিত হয়েছে মোট ৩টি স্থায়ী শহিদমিনার। বাকি দুটি হলো আলতাব আলী পার্কে যা স্থাপিত হয় ১৯৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এবং লুটন শহরে স্থাপিত হয় ২০০৪ সালের ৮ই আগস্ট।

জাপানে শহিদমিনার

জাপানের রাজধানী টোকিওর প্রাণকেন্দ্র তোসিমা সিটিতে ন্যাশনাল থিয়েটার হলের পাশে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের আদলেই ২০০৫ সালে নির্মিত হয়েছে একটি মিনার। জাপান সরকারের বরাদ্দ দেয়া জমিতে এই মিনারটি নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে। এর আয়তন উচ্চতায় ২.৬ মিটার এবং প্রস্থে ২.৫ মিটার। সম্পূর্ণ স্টিল ফ্রেমে তৈরি এটি। এই শহিদমিনারটির সামনে একটি সাদা ফলকে জাপানি, ইংরেজি ও বাংলা-এই তিন ভাষায় পাশাপাশি লেখা আছে–'শহিদমিনার : ভাষার প্রতি ভালোবাসার মিনার'। ১৬ই জুলাই ২০০৬ সালে এটি উদ্‌বোধন করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধ

এটি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের ওরমন্ড স্ট্রিটের অ্যাসফিল্ড পার্কে অবস্থিত। ২০০৬ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিসৌধটি সম্পূর্ণ পাথরের তৈরি। এর সম্মুখভাগে একটি গ্লোব বসানো। মূলত বিশ্বব্যাপী ভাষা ও সংস্কৃতিকে উৎসাহ দানে ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করার পর বহির্বিশ্বে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর সফল বাস্তবায়ন এই স্মৃতিসৌধ।

ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্যারিসে শহিদমিনার

প্যারিসে অবস্থিত প্রধান কার্যালয়ে একটি শহিদমিনার নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ইউনেস্কো। ২৭শে মে ২০১১ সালে জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক চর্চার বৈঠকখানায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে এ আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন ইউনেস্কোর তৎকালীন মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা। প্রধানমন্ত্রীও এ মহৎ উদ্যোগকে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানান এবং বলেন, এ কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ইউনেস্কোকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে বাংলাদেশ সরকার। এর ফলে বাঙালি ও বাংলাদেশের জনগণের গর্বের প্রতীক শহিদমিনার বিশ্বের মাঝে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল।

ইতালিতে শহিদমিনার

ইতালির আদরিয়াটিকো সাগরের কূলঘেঁষা বন্দর শহর বারিতে নির্মিত হয় শহিদমিনার। বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় প্রশাসন জায়গা দেয় এবং বাঙালি কমিউনিটির অর্থায়নে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে শহিদমিনারটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। । ইতালির দ্বিতীয় শহিদমিনার স্থাপিত হয় রাজধানী রোমে। ভিয়া পানামার ইসহাক রবিন পার্কে এটি নির্মিত হয় ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সাত মিটার দৈর্ঘ্য ও দুই দশমিক দশ মিটার প্রস্থের শহিদমিনারটি নির্মাণের খরচ বহন করে বাংলাদেশ সরকার।

এছাড়া দেশের বাইরে ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস শহরে নির্মিত হয়েছে স্থায়ী শহিদমিনার। তবে অস্থায়ী একটি শহিদমিনার রয়েছে নিউইয়র্ক শহরে। জাতিসংঘ দপ্তরের সামনে এ মিনারটি নির্মাণ করেছে 'মুক্তধারা । ■

গল্প

পলাশ শিমুল

হামীম রায়হান

একুশে ফেব্রুয়ারির বাকি আর মাত্র পনেরো দিন। পলাশ, শিমুল যমজ ভাই। তারা এবার অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে বাংলা নিয়ে পড়ছে। ওরা সিদ্ধান্ত নেয় এবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে একটা কিছু করবে। কিন্তু কী করা যায়?

তারা তাদের বিভাগের সব বন্ধুদের নিয়ে বসল। সবাই তাদের এমন চিন্তাকে সাধুবাদ জানাল। একেকজন একেকভাবে প্রস্তাব করল। কেউ বলল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা করা যায়, কেউ গান, কেউবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবে আবির বলল, আমরা বাংলা ভাষা একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে একটা কুইজের আয়োজন করতে পারি। প্রশ্ন ছাপিয়ে বিভিন্ন স্কুলে পাঠাব এবং যাচাই-বাছাইয়ের পর একুশে ফেব্রুয়ারির দিন শহিদমিনারে অনুষ্ঠান করে পুরস্কার দিব। এতে কিছু ছাত্রছাত্রী বাংলা সম্পর্কে জানবে, পড়বে। আবিরের প্রস্তাব সবার ভালো লাগল। একটা সমস্যা কিন্তু থেকে যায়। সেটা হলো টাকা! প্রতিযোগিতার জন্য, পুরস্কারের জন্য টাকা লাগবে। শিমুল প্রস্তাব করে তারা সবাই দুইশ করে টাকা দিলে অনুষ্ঠান করা যাবে। আর আলিম স্যারের কাছে গেলে তিনি পুরস্কারের বই ব্যবস্থা করে দিবেন।

তারা সবাই বাংলা বিভাগের প্রফেসর আলিম স্যারের কাছে গিয়ে এই অনুষ্ঠানের কথা বলে। শুনে আলিম স্যার খুবই আনন্দিত! তিনি অবশ্য এসব কাজে সব সময় উৎসাহ দেন। তিনি কথা দেন একশ বই ব্যবস্থা করে দেওয়ার!

স্যারের উৎসাহ পেয়ে পলাশ, শিমুলরা কাজে নেমে

পড়ে। বাংলা ভাষা ও একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করে। তারপর সবাই যাচাই-বাছাই করে পঞ্চাশটা প্রশ্ন দিয়ে একটা সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন তৈরি করে।

পরের দিন তা ফটোকপি করে বিভিন্ন স্কুলে পাঠানো হয়। স্কুলের শিক্ষকরা তাদেরকে এমন কাজের জন্য ধন্যবাদ জানায়।

দেখতে দেখতে সময় শেষ হয়ে আসে। পরশু একুশে ফেব্রুয়ারি। আজ জমা পড়া ফরমগুলো বাছাই করা হবে। পলাশ, শিমুলরা সবাই এল। সবাই কলেজ লাইব্রেরিতে বসে জমা পড়া ফরমগুলো দেখতে থাকে। আলিম স্যার একবার এসে দেখে যান। প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রায় সবাই দিতে পেরেছে! এটা দেখে পলাশদের বেশ আনন্দ লাগছে। তাদের তো এটাই লক্ষ্য ছিল। তবে সবদিক বিবেচনা করে একশ জনকে আলাদা করা হয়। এই একশ জনকে বই দেওয়া হবে। আর যারা সেদিন উপস্থিত থাকবে, তাদেরকে কলম দেওয়া হবে।

অবশেষে এল একুশে ফেব্রুয়ারির সকাল। পলাশ, শিমুলরা শহিদমিনারে ব্যানার, মাইক, চেয়ার বসানোর কাজ সেরে নিল। দুপুর হতেই ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করে। শহিদমিনার চত্বর ভরে যায়। আলিম স্যারও চলে আসেন পুরস্কার নিয়ে। অতিথি হিসেবে কলেজের অধ্যক্ষ স্যার ও পৌরসভার মেয়র সাহেবও চলে এলেন। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সবাইকে নিয়ে শহিদমিনারে ফুলের মালা দেওয়ার পর আলিম স্যার মাতৃভাষার গুরুত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। মেয়র স্যার ও অধ্যক্ষ স্যার সংক্ষেপে এমন আয়োজনের প্রশংসা করেন। সর্বশেষ বিজয়ী একশ জনকে বই ও সবাইকে কলম পুরস্কার দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সুন্দরভাবে এমন অনুষ্ঠানটি শেষ করতে পেরে পলাশ, শিমুলরা বেশ আনন্দিত!

পরেরদিন বেশ বড়ো করে পত্রিকায় নিউজ ছাপা হয়। পলাশ, শিমুল সিদ্ধান্ত নেয় প্রতি বছর এমন আয়োজন করে ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষার কিছু তথ্য জানাবে। এতে নিজেরাও কিছু জানবে, মাতৃভাষার কিছু দায়িত্বও পালন হবে! ■

আত্মদান

মো. তাসিন হোসেন

যাঁদের রক্তের বিনিময়ে
পেলাম মোরা বাংলা ভাষা
তাদের প্রতি রইল
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

সবার হৃদয়ের মাঝে
থাকবে তাঁরা ততদিন
বাংলা ও বাঙালি
রবে যতদিন।

৭ম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

বাংলা ভাষা

তাসনিম সুহিনা

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বড়োই মধুর লাগে
অন্য ভাষায় বললে কথা
মন ভরে না তাতে,
বাংলা আমার ভাইয়ের ভাষা
তাই তো মায়ায় ভরা
বলতে কথা প্রাণ ভরে যায়
ছড়িয়ে গেছে ধরা।
বাংলা আমার বোনের ভাষা
নেই তুলনা তার
রক্ত দিয়ে কিনেছি মোরা
শ্রদ্ধা হাজার বার।

নবম শ্রেণি, পি.এন. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

শিশু-কিশোরদের ভাবনায় বইমেলা

আমাদের প্রাণের মেলা–বইমেলা। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলা এনে দেয় ভিন্ন রকম উৎসবের আমেজ। মাসব্যাপী চলা বইমেলাকে ঘিরে লেখক-পাঠক, প্রকাশক এবং প্রকাশনা সংশ্লিষ্টদের নজর থাকে বিশেষভাবে। পিছিয়ে নেই আমাদের ছোট্ট সোনামণিরাও। বইমেলায় প্রতি শুক্র ও শনিবারে তাদের জন্য থাকে শিশুপ্রহর। শিশুপ্রহরে বাংলা একাডেমির চত্বরজুড়ে ছুটাছুটি, মা-বাবার হাত ধরে স্টলে স্টলে বই দেখে, বই কিনে, নতুন বই বুকে জড়িয়ে বাড়ি ফিরা ছাড়া অন্যান্য দিনও তাদের উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয়। এবারের বইমেলাকে নিয়ে তাদের প্রত্যাশা কেমন, কী ভাবছে তারা, কী কী পরিকল্পনা এ সবই জানাচ্ছেন- ***রুমান হাফিজ***

জেলা-উপজেলায় বইমেলা চাই

ইবতিদা ইদ্রিছ

দশম শ্রেণি, মগবাজার গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা।

ফেব্রুয়ারি মাস আসলেই আমার ভেতরে এক ধরনের আবেগ আর অনুভূতি খেলে যায়। যখন থেকে বুঝতে শুরু করি তখন থেকেই বইমেলার প্রতি এক অদেখা ভালোবাসার জন্ম নেয় আমার মনে। প্রিয় লেখক বা কার লেখা পড়তে ভালো লাগে এমন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা সত্যিই কষ্টসাধ্য। কারণ প্রত্যেক লেখকই আমার প্রিয়। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়কে, যাঁর লেখনীর স্পর্শে বাংলার কথাশিল্প অর্থাৎ উপন্যাস ও ছোটোগল্প জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেছে। এরপর রয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ, যার হিমু ও মিসির আলি চরিত্র আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে। এছাড়াও রয়েছেন জাফর ইকবাল স্যারের সায়েন্স ফিকশন, আনিসুল হক, রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প ও উপন্যাস, বিদ্রোহী কবি নজরুল, বুদ্ধদেব বসুসহ আরো অনেকে। বইমেলা হলো এক মহৎ অনুভবেরই প্রেরণাস্থল। কূপমণ্ডুক অন্ধ ধারণা থেকে মুক্তি দিতে বইমেলার তুলনা নেই। ঢাকার মতো দেশের প্রতিটা জেলা-উপজেলায় বইমেলার আয়োজন হোক এই প্রত্যাশা করি।

এবার আরো বেশি বই কিনব

দেবার্পন দত্ত

ষষ্ঠ শ্রেণি, প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, চট্টগ্রাম।

বইমেলা বলতেই মনটা কেমন যেন গল্প গল্প ভাব হয়ে উঠে। যখন চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময়ে বইমেলার আয়োজন করে তখনই মনটা আনন্দে নেচে উঠে। বই পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। গল্পের বই হলে তো কথাই নেই! গল্প লিখতেও ভালো লাগে। বইমেলা খুব ভালো লাগে কারণ বইমেলা জ্ঞানী-গুণী মানুষ এবং কবি-সাহিত্যিকদের আনাগোনায় মুখরিত হয়ে উঠে। যাঁদের সাহচর্য পেয়ে আমরা জ্ঞানার্জন করতে পারি, বিভিন্ন বই পড়ে নিজেকে আনন্দ দিতে পারি। গল্প-কবিতার অনেক অনেক বই কিনি বইমেলা থেকে। এছাড়াও ভৌতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক এবং গোয়েন্দাভিত্তিক বইও কিনি। এবারের বইমেলাতেও আরো বেশি বই কিনার ইচ্ছা আছে।

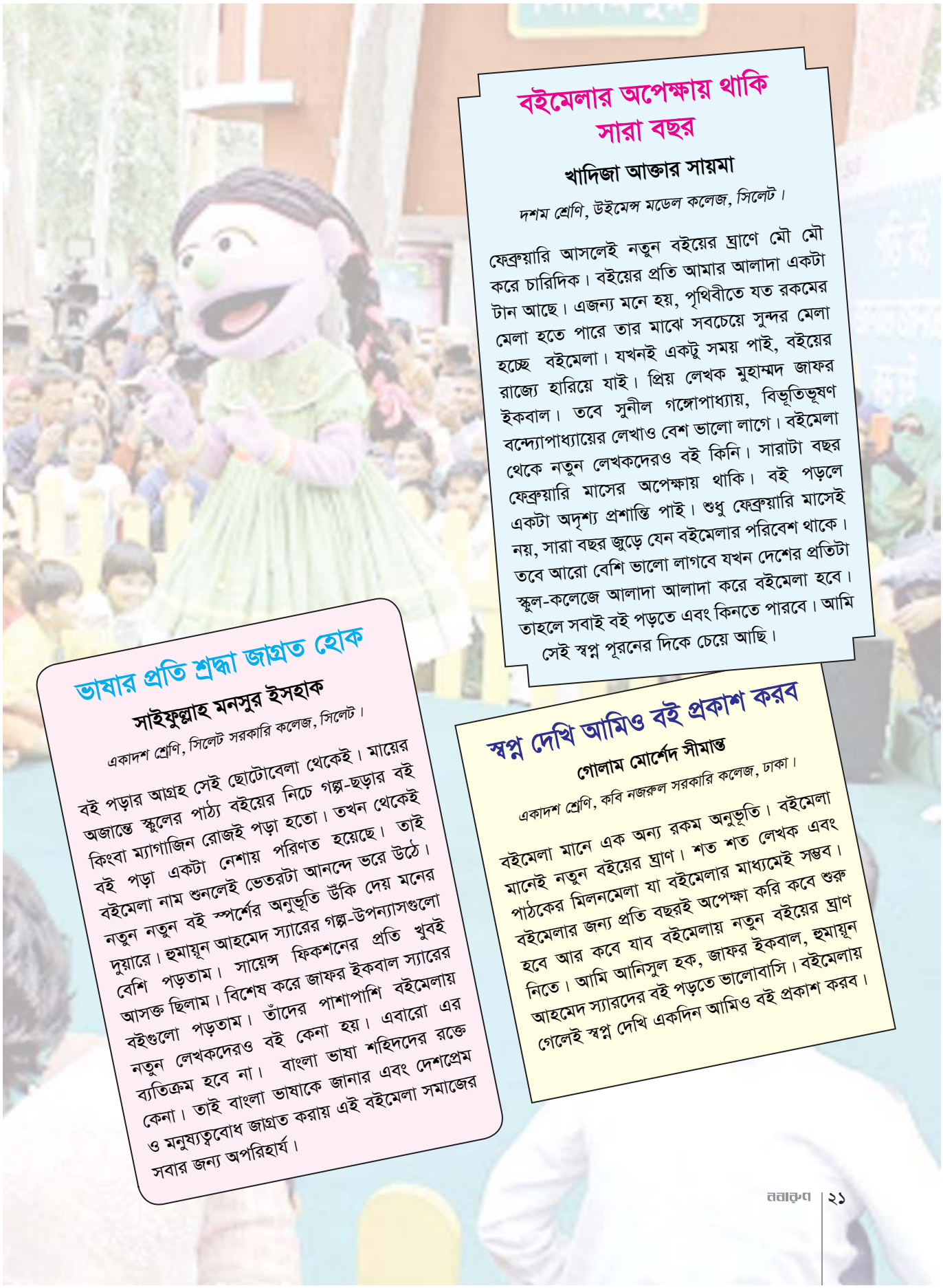

বইমেলার অপেক্ষায় থাকি সারা বছর

খাদিজা আক্তার সায়মা

দশম শ্রেণি, উইমেন্স মডেল কলেজ, সিলেট।

ফেব্রুয়ারি আসলেই নতুন বইয়ের ঘ্রাণে মৌ মৌ করে চারিদিক। বইয়ের প্রতি আমার আলাদা একটা টান আছে। এজন্য মনে হয়, পৃথিবীতে যত রকমের মেলা হতে পারে তার মাঝে সবচেয়ে সুন্দর মেলা হচ্ছে বইমেলা। যখনই একটু সময় পাই, বইয়ের রাজ্যে হারিয়ে যাই। প্রিয় লেখক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। তবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও বেশ ভালো লাগে। বইমেলা থেকে নতুন লেখকদেরও বই কিনি। সারাটা বছর ফেব্রুয়ারি মাসের অপেক্ষায় থাকি। বই পড়লে একটা অদৃশ্য প্রশান্তি পাই। শুধু ফেব্রুয়ারি মাসেই নয়, সারা বছর জুড়ে যেন বইমেলার পরিবেশ থাকে। তবে আরো বেশি ভালো লাগবে যখন দেশের প্রতিটা স্কুল-কলেজে আলাদা আলাদা করে বইমেলা হবে। তাহলে সবাই বই পড়তে এবং কিনতে পারবে। আমি সেই স্বপ্ন পূরনের দিকে চেয়ে আছি।

ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হোক

সাইফুল্লাহ মনসুর ইসহাক

একাদশ শ্রেণি, সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট।

বই পড়ার আগ্রহ সেই ছোটোবেলা থেকেই। মায়ের অজান্তে স্কুলের পাঠ্য বইয়ের নিচে গল্প-ছড়ার বই কিংবা ম্যাগাজিন রোজই পড়া হতো। তখন থেকেই বই পড়া একটা নেশায় পরিণত হয়েছে। তাই বইমেলা নাম শুনলেই ভেতরটা আনন্দে ভরে উঠে। নতুন নতুন বই স্পর্শের অনুভূতি উঁকি দেয় মনের দুয়ারে। হুমায়ূন আহমেদ স্যারের গল্প-উপন্যাসগুলো বেশি পড়তাম। সায়েন্স ফিকশনের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলাম। বিশেষ করে জাফর ইকবাল স্যারের বইগুলো পড়তাম। তাঁদের পাশাপাশি বইমেলায় নতুন লেখকদেরও বই কেনা হয়। এবারো এর ব্যতিক্রম হবে না। বাংলা ভাষা শহিদদের রক্তে কেনা। তাই বাংলা ভাষাকে জানার এবং দেশপ্রেম ও মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করায় এই বইমেলা সমাজের সবার জন্য অপরিহার্য।

স্বপ্ন দেখি আমিও বই প্রকাশ করব

গোলাম মোর্শেদ সীমান্ত

একাদশ শ্রেণি, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।

বইমেলা মানে এক অন্য রকম অনুভূতি। বইমেলা মানেই নতুন বইয়ের ঘ্রাণ। শত শত লেখক এবং পাঠকের মিলনমেলা যা বইমেলার মাধ্যমেই সম্ভব। বইমেলার জন্য প্রতি বছরই অপেক্ষা করি কবে শুরু হবে আর কবে যাব বইমেলায় নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিতে। আমি আনিসুল হক, জাফর ইকবাল, হুমায়ূন আহমেদ স্যারদের বই পড়তে ভালোবাসি। বইমেলায় গেলেই স্বপ্ন দেখি একদিন আমিও বই প্রকাশ করব।

স্বরধ্বনি তাহলে ১১টি নয়!

তারিক মনজুর

সকালবেলা। ভাষা-দাদু উঠানে বসে কাগজ আর আঠা দিয়ে কী যেন করছিলেন। আজ নেহাদের স্কুল বন্ধ। নেহা আর ওর বন্ধুরা এসেছে ভাষা-দাদুর বাড়িতে। ওদেরকে দেখে মরিয়ম চাচি বললেন, 'ভালো সময়েই এসেছ! পিঠা বানাচ্ছি।'

মরিয়ম চাচি উঠানের পশ্চিম দিকের রান্নাঘরে বসে পিঠা বানাচ্ছিলেন। ভাপ উঠতে দেখে বোঝাই যাচ্ছে কী পিঠা। সবাই ভাষা-দাদুকে পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটল। পিলটু শুধু ভাষা-দাদুর পাশে বসে তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল। পত্রিকা থেকে ছবি কেটে কেটে তিনি সাদা কাগজে লাগাচ্ছেন। এগুলো খেলোয়াড়দের ছবি। পিলটু বলল, 'দাদু, তুমি খেলোয়াড়দের ছবি কেটে কাগজে লাগাচ্ছ কেন?'

ভাষা-দাদু হেসে বললেন, 'এগুলো কাদের ছবি বলতে পারো?'

পিলটু একটু কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'বুঝেছি! এরা বাংলাদেশের খেলোয়াড়। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাই না? ... কিন্তু, দাদু, তুমি এদের ছবি কাগজে লাগাচ্ছ কেন?'

ভাষা-দাদু বুক ফুলিয়ে বললেন, 'ইতিহাসে যারা বাংলাদেশের জন্য নাম করে, আমি তাদের ছবি সেঁটে রাখি কাগজে।'

‘তার মানে এরকম ছবি লাগানো কাগজ তোমার কাছে আরো আছে। তাই না?’

দাদু উত্তর দেয়ার আগেই নেহারা হাতে ভাপা পিঠা নিয়ে পিলটুর কাছে এল। মজা করে বলল, ‘দেখ, পিলটু, আমরা কী খাচ্ছি!’

পিলটু জানে পিঠা সেও পাবে, তাই বেশি ব্যস্ত হলো না। বরং ভাষা-দাদুর কাগজ দেখিয়ে বলল, ‘ভাষা-দাদু কী করছেন দেখেছ?’

অন্যরা সত্যি অবাক হলো। দাদু একটা কাগজে এগারো জন খেলোয়াড়ের ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়েছেন। এরা বিশ্ব যুব ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিনু ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘খেলে এগারো জন। কিন্তু দলে তো আরো খেলোয়াড় থাকে। তাদের ছবি কোথায়?’

বিনুর কথায় দাদু একটু নড়েচড়ে বসলেন। তাই তো! খেলোয়াড় তো আরো আছে। তাদের ছবি কোথায়? পত্রিকা ঘেঁটে তিনি অন্যদের ছবি পেলেন না। নেহা বলল, ‘থাক, এগারো জনই থাক। আমাদের স্বরধ্বনি যেমন ১১টা।’

নেহার কথা শুনে ভাষা-দাদু সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে তাকালেন। নেহা যেন বড়ো একটা ভুল কথা বলে ফেলেছে! দাদু বললেন, ‘না, না, না, স্বরধ্বনি তো ১১টা নয়। স্বরধ্বনি ৭টি।’

‘স্বরধ্বনি সাতটি!’ প্রায় সবাই অবাক হয়। তা কী করে হয়?

‘কিন্তু, দাদু, ছোটোদের বর্ণ শেখার সব বইতেই তো আমরা ১১টা স্বরধ্বনি দেখতে পাই।’ বিনু বলে।

‘এই তো, এখানেই আমাদের ভুল। আমরা চোখে যা দেখি, তা ধ্বনি নয়। আমরা কানে যা শুনি, সেটা হলো ধ্বনি। আর চোখে যা দেখতে পাই, সেটা হলো বর্ণ।’

‘তাহলে আমাদের স্বরধ্বনি কয়টা?’ নেহা জানতে চায়।

‘এগারো থেকে পাঁচ গেলে কত থাকে?’

‘ছয়!’ পিলটু বলে, ‘কিন্তু, দাদু, তুমি সরাসরি বললেই তো পারো, আমাদের স্বরধ্বনি ছয়টি।’

‘উত্তর তো ছয় না। তাই এভাবে বলছি। ... প্রথমত এগারোটা স্বরবর্ণের মধ্যে পাঁচটিকে আমাদের বাদ দিতে হবে। এগুলো হলো ঈ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ। বাকি থাকে অ, আ, ই, উ, এ, ও। পাঁচটি বাদ দিয়ে যে ছয়টি থাকল, সেগুলো হলো ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি স্বরধ্বনি।’

‘দাদু, পাঁচটিকে তুমি বাদ দিচ্ছ কেন?’ নেহা জানতে চায়।

ভাষা-দাদু এবার বোঝানোর ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, ‘লক্ষ করো, হ্রস্ব ই আর দীর্ঘ ঈ-এর উচ্চারণ একই রকম। এ কারণে হ্রস্ব-ই দিয়ে ইদ আর দীর্ঘ-ঈ দিয়ে ঈদ লিখলে একই উচ্চারণ হয়। আবার হ্রস্ব উ আর দীর্ঘ ঊ-এর উচ্চারণ একই রকম। তাই হ্রস্ব-উ দিয়ে উষা কিংবা দীর্ঘ-ঊ দিয়ে ঊষা লিখলে উচ্চারণে কোনো পার্থক্য হয় না। আমি তো আগেই বলেছি, ধ্বনি হলো উচ্চারণের ব্যাপার। এখানে দীর্ঘ ঈ আর দীর্ঘ ঊ-এর আলাদা কোনো উচ্চারণ আমরা পাই না। এগুলো হ্রস্ব ই আর হ্রস্ব উ-এর মতোই।’

‘বুঝলাম দীর্ঘ-ঈ আর দীর্ঘ-ঊ বাদ।’ বিনু বলে, ‘কিন্তু তুমি ঋ, ঐ আর ঔ-কে বাদ দিচ্ছ কেন?’

‘ঋ-এর উচ্চারণ রি-এর মতো। র একটি ব্যঞ্জনধ্বনি। তাই উচ্চারণের দিক থেকে ঋ-কে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা যায়। অতএব ঋ বাদ। আর ঐ আর ঔ – এই দুটিও বাদ। কারণ এগুলো যৌগিক স্বরধ্বনি।’

‘যৌগিক পদার্থের কথা শুনেছি, দাদু। যেমন – পানি একটা যৌগিক পদার্থ। কিন্তু যৌগিক স্বরধ্বনি তো শুনিনি!’ ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী পিলটু বলে।

‘হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে হয় পানি। দুটি মৌলিক পদার্থ মিলে একটি পদার্থ হলে তাকে বলে যৌগিক পদার্থ। তাই তো? এখানেও তাই। দুটি মৌলিক স্বরধ্বনি মিলে একটি স্বরধ্বনি হলে তাকে বলে যৌগিক স্বরধ্বনি। একে দ্বিস্বরধ্বনিও বলে।’

‘মানলাম, ঐ আর ঔ হলো যৌগিক স্বরধ্বনি।’ নেহা বলে, ‘কিন্তু এদের মধ্যে কোন কোন স্বরধ্বনি আছে?’

‘উচ্চারণ করেই দেখ। ও আর ই মিলে হয় ঐ। ও আর উ মিলে হয় ঔ।’

‘তাহলে আমাদের স্বরধ্বনি ৬টি?’ পিলটু বলে।

‘না, আরেকটি আছে। সেটি আমাদের বর্ণমালায় নেই, তবে আমরা উচ্চারণ করি। সেটি হলো অ্যা।’

‘অ্যা?’ সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে।

‘হ্যাঁ, অ্যা। অ্যা আমাদের বর্ণমালাতে নেই। কিন্তু অনেক শব্দ উচ্চারণ করতে গেলে অ্যা ধ্বনিটি চলে আসে। যেমন এক, একা, এগারো – এগুলোর শুরুর ধ্বনিটি খেয়াল করো অ্যা-এর মতো উচ্চারিত হয়।’

‘দাদু, তুমি এক- এগারো বলছ। একুশও কি এরকম?’ পিলটু বলে।

‘না, না, একুশ নয়। একুশ উচ্চারণ করে দেখ, শুরুতে কিন্তু এ-এর মতো উচ্চারণ হয়। ইংরেজি অনেক শব্দে অ্যা ধ্বনি তোমরা পাবে। যেমন – অ্যাকাডেমি, অ্যাকাউন্ট, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি।’

‘আমাদের বর্ণমালায় আমরা ‘অ্যা’-কে তো কখনও দেখিনি!’ বিনু বলে।

‘দেখবে কী করে! ওই যে বলছিলাম, ধ্বনি হলো উচ্চারণের ব্যাপার। অ্যা আমাদের বর্ণমালায় নেই, তবে উচ্চারণে আছে। বর্ণমালায় নেই বলে Ambulance শব্দের তিন রকম বানান পাওয়া যায়।’ এই বলে দাদু কাগজে লিখে দেখালেন– এম্বুলেন্স, এ্যাম্বুলেন্স, অ্যাম্বুলেন্স।

‘তিন রকম বানান? তাহলে আমরা কোনটা লিখব?’ নেহা বলে।

কোনটা লিখব দাদু বলতে যাবেন, তার আগেই মরিয়ম চাচি একটা প্লেটে পিঠা নিয়ে এলেন। বললেন, ‘এগুলো পিলটুর জন্য।’

সবাই তাকিয়ে দেখল, প্লেটে না হলেও দশটা পিঠা রয়েছে। অতএব সবাই হৈ হৈ করে উঠল, ‘তা হবে না। আমরা মোটে একটা করে খেয়েছি।’ ■

আসল রূপ

আহমেদ টিকু

মুখের ভাষা কেড়ে নেবে
অত সহজ নয়,
বুকের রক্ত দিতে জানি
করি নাকো ভয়।

আমরা তো নই খাঁচার পাখি
শিখাতে চাও বুলি,
যুগ–জনমের মায়ের ভাষা
কেমন করে ভুলি।

শাসন করো শোষণ করো
মুখ বুজে সব সই,
মনের যত দুঃখ জ্বালা
নিজের ভাষায় কই।

সেই ভাষাটা কাড়তে এলে
থাকব না তো চুপ,
তখন বাবা শান্ত জাতির
দেখবে আসল রূপ।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের গল্প

মুহাম্মদ ইসমাঈল

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। ওরা দুই বোন। স্বরবর্ণ পড়ে ক্লাস ফাইভে। ব্যঞ্জনবর্ণ পড়ে ক্লাস সিক্সে। স্কুল ছুটির আগে রাসেল স্যার বললেন, তোমরা সবাই মন দিয়ে শোনো। সামনে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারি কী দিবস তোমরা কি জানো ? স্বরবর্ণ হাত উঠিয়ে বলল, স্যার আমি বলব। স্যার বললেন বলো।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
তাইয়্যেবাহ বলল, স্যার আমিও জানি।
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

তাইয়্যেবার দেখাদেখি তামান্নাও বলল, স্যার আমিও জানি। তাইয়্যেবাহ ও তামান্না ওরা দুই বোন। দুজনার অনেক মিল। যা বলবে একসাথে বলা চাই ওদের। তামান্না ছোটো বোন। ওর আবার মাঝে মাঝে পাগলা মেজাজ ওঠে। ও সবাইকে তুই বলে, ছোটো-বড়ো কেউ কিছু মনে করে না।

এবার স্যার একগাল হেসে বললেন, ঠিক আছে, তোমরা অনেকেই যে জানো, সেটা আমি জানি।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে অর্কিড স্কুলে। থাকবে আলোচনা সভা এবং তোমাদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

তোমরা কে কোনা বিষয়ে অংশ নেবে তা আগে থেকে ঠিক করে নিও। নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়ে অংশ নিতে পারো।

আশিক বলল, স্যার আমি পাখির ডাক শোনাবো।

তাইয়্যেবাহ বলল, আমি নাচ করব।

তামান্না বলল, আমিও নাচ করব।

স্বরবর্ণ বলল, আমি গান গাইব।

সানিস বলল, আমি আবৃত্তি করব।

ফাহিম বলল, আমি কোরান তেলাওয়াত করব।

বৃষ্টি বলল, আমি অভিনয় করব।

স্যার বললেন, ঠিক আছে। কোনো বিষয়ে আমাকে দরকার হলে জানাবে । কেমন ?

রাতে পড়ার টেবিলে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মা সবকিছু শুনলেন। স্বরবর্ণ বলল, মা আমি কিন্তু গান গাইব। ব্যাঞ্জনবর্ণ বলল, মা আমি কবিতা আবৃত্তি করব। কিন্তু কোন কবিতা আবৃত্তি করব বুঝতে পারছি না। মা আমাদের সাহায্য করো এ বিষয়ে।

মা বললেন ঠিক আছে, একটু ভেবে নেই।

আচ্ছা স্বরবর্ণ, তুমি এই গানটা গাইতে পারো-

আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা—

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলতে পারি।’

গানের কথাগুলো লিখে দিচ্ছি। তুমি আগে গানটা মুখস্থ করে নেবে কেমন।

আর ব্যঞ্জনবর্ণ, তুমি কবি আল মাহমুদের সেই বিখ্যাত ছড়াটা নিতে পারো।

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুরবেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়?
বরকতের রক্ত।

স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ দুজনেই খুশি হয়ে যায়। ব্যঞ্জনবর্ণ বলে, আচ্ছা মা বরকত কে ? এই কবিতায় যে বরকত নামটি এসেছে।

মা বললেন, আচ্ছা তাহলে শোনো।

একুশে ফেব্রুয়ারির এই দিনে মাতৃভাষা দাবির মিছিল হয়েছিল। সেদিন পুলিশের গুলিতে শহিদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ, আরো নাম না জানা অনেকে। সেই বরকতের কথাই এই কবিতায় লেখা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে তখন ছিল এক দেশ। বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

পশ্চিম পাকিস্তানিরা চাইত না আমরা মায়ের ভাষায় কথা বলি। অথচ মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার সবারই আছে।

শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বাংলা ভাষার মান। তাদের সম্মান জানাতেই একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। সারা বিশ্বব্যাপী।

ব্যঞ্জনবর্ণ বলল, আমাদের বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা। মধুর চেয়েও মধুর।

স্বরবর্ণ বলল, বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে পেয়ে সত্যি আমরা ধন্য।

মা বললেন, তোমরা দুজনই ঠিক বলেছ। তোমরা দুজনই বুদ্ধিমান। ভবিষ্যতে তোমরা আরো বেশি বেশি করে জানবে। ■

বাংলা ফন্ট চালু করল জাতিসংঘ

ইশরাত জাহান

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ‘বাংলা ভাষা’-র সম্মানে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ‘ইউএন বাংলা’ নামে একটি বাংলা ফন্ট উদ্‌বোধন করেছে। একই সঙ্গে সংস্থাটি তাদের গত বছরের (২০১৯) মানব উন্নয়ন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ বাংলায় প্রকাশ করেছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার একটি হোটেলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন এই ফন্ট উদ্‌বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব ও ইউএনডিপির এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক কান্নি উইগনারাজা, ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি উপস্থিত ছিলেন। ইউএনডিপির ২০১৯ সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ বাংলায় রচনা করেছেন ড. সেলিম জাহান। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিবেদন তৈরি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকার পর সম্প্রতি অবসরে গেছেন।

বাংলাকে জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষা করার চেষ্টা চলছে বহুদিন ধরে। তবে তার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে হবে বাংলাদেশকে। বর্তমানে জাতিসংঘে ছয়টি দাফতরিক ভাষা রয়েছে। এগুলো হলো- ইংরেজি, আরবি, চাইনিজ, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান এবং স্প্যানিশ। ড. সেলিম জাহান বলেন, মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রথম উদ্‌বোধন হয় ১৯৯০ সালে। এর পরের বছর এই রিপোর্ট বাংলায় প্রকাশিত হয়, সেটিরও রচয়িতা তিনিই ছিলেন। বাংলাদেশের জন্য প্রতি বছর সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয় জানিয়ে তিনি বলেন, এটি আমাদের নিজস্ব সম্পদ।

ইউএনডিপি জানায়, বাংলা বর্ণমালার যুক্তাক্ষর ও মাত্রাসহ অন্যান্য বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে এই ফন্ট তৈরি করা হয়েছে। যা সংস্থাটির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। ■

আমরা করব জয়

নাসিম

আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারি। এই দিনটিতে সবাই শহিদমিনারে শহিদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে যায়। যারা ভাষা আন্দোলন করে শহিদ হয়েছেন তারা হলেন– সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক এবং আরো অনেকে।

তোমরা কি বুঝতে পেরেছ তখন যদি এই আন্দোলন না হতো–তবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা হতো না। তাই তো এ দিনটি আমাদের কাছে এত তাৎপর্যপূর্ণ স্যারের কথা তারা মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

'আমরা করব জয়' একটি প্রতিবন্ধী স্কুলের নাম। এখানে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কিছু মানসিক প্রতিবন্ধী আবার কিছু সংখ্যক শারীরিক প্রতিবন্ধী। যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী তাদের চলতে-ফিরতে কষ্ট হয়। কিন্তু তারা সব কথা বোঝে। একুশে ফেব্রুয়ারি কেন এত স্মরণীয় দিন, স্যারের কথায় তারা বুঝেছে। তাই তারা সবার মতো শহিদমিনারে ফুল দিয়ে সম্মান জানাতে যাবে। আর যারা মানসিক প্রতিবন্ধী তারাও খুশি। তারা সবার সাথে শহিদমিনারে যেতে পারবে এটা বুঝেছে। 'আমরা করব জয়' স্কুলের প্রধান শিক্ষক অন্য শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করলেন ওরা তো সবাই হাঁটতে পারে না। ওদের স্কুলে মোট ছাত্র-ছাত্রী ৫০জন। তার মধ্যে পনেরো জন হাঁটতে পারে না। তারা হুইলচেয়ারে চলাফেরা করে।

স্যার বললেন, আমরা একটি মিনিবাস ভাড়া করে ওদের নিয়ে যাব। আর এজন্য ডি.এম.পি থেকে অনুমতি নিতে হবে। আপনারা চিন্তা করবেন না। আগামীকাল ওদেরকে গাড়িসহ বাবা অথবা মা যে- কোনো একজনকে সকাল ৭টার মধ্যে স্কুলে আসতে বলবেন। প্রত্যেকের হাতে ১টি করে লাল গোলাপের ব্যবস্থা করবেন। মিটিং-এ ছেলে-মেয়েরা স্যারের কথা শুনে খুব খুশি হলো। পরদিন তারা স্কুলে এসে শহিদমিনারের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। পথে তাদের কোনো সমস্যাই হয়নি। শহিদমিনারে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, র‍্যাব এবং পুলিশ সবাই তাদেরকে শহিদমিনারে ফুল দিতে সাহায্য করল।

তারা কেউ কেউ ইশারায় বলে, আমি খুব খুশি। আবার কেউ কেউ ফুল দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। সকলে স্কুলের স্যারদের এ ধরনের একটি উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানালো। ■

মো. শাহিদী হাসিব, ১ম শ্রেণি, মডেল একাডেমি, মিরপুর, ঢাকা

ডাব্বু

জাকির হোসেন কামাল

ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে আছে ডাব্বু। ডাব্বু ওর আসল নাম না। আসল নাম জয়। প্রায় বছরই বার্ষিক পরীক্ষাতে ডাব্বা মারে সে, তাই সকলে নাম দিয়েছে ডাব্বু। তাতে ডাব্বুর কোনো দুঃখ নেই। ওর সব সময় হাসিহাসি মুখ। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, জয় এই কদিন কোথায় ছিলি?

: হরির মায়ের বড়ো অসুখ স্যার।

: হরির মায়ের অসুখ হলে হরিকে ডাকবে। তোর কী?

: স্যার হরি তো ছোটো। তাই আমি ওনাকে নিয়ে এই কদিন হাসপাতালে ছিলাম।

: ঠিক আছে। এখন থেকে নিয়মিত ক্লাস করবি।

: জি স্যার।

ওই জি স্যার পর্যন্তই। কদিন ক্লাস করতে না করতেই আবার উধাও ডাব্বু। ডাব্বুটা এ রকমই। অমুকের দুঃখে, তমুকের দুঃখে এগিয়ে যাবে ডাব্বু। শুধু পাড়ায় নয় পুরো গ্রামেই জেনে গেছে, যে-কারো বিপদে-আপদে ডাব্বুকে পাওয়া যায়। কারো ধান কাটার লোক নেই, ডাব্বুকে ডাকো। দিনভর খেটে খুঁটে ধান কেটে আসবে। কারো গাড়ির চাকা খাঁদে পড়ে আছে, ডাব্বুকে ডাকো। দলবল নিয়ে ডাব্বু তুলে দিয়ে আসবে। আয়েশাদের গরুর বাছুরটা ছুটে গেছে, ডাব্বুকে ডাকো। ওটাকে ঘরে দিয়ে আসবে ডাব্বু। পাশের বাড়ির করিম জ্যাঠাদের ঘরে বাজার নেই, ডাব্বু আছে। মিলাদ, মেজবান, দোয়া-মাহফিল সবখানেই ডাব্বু। পড়ালেখার চেয়ে এসব কাজেই আনন্দ বেশি ডাব্বুর।

ক্লাসের ফার্স্ট বয় রনি। তাকে সবাই খাতির করে। ডাব্বুও। তবে অন্যরা যেখানে রনির কাছে অঙ্কটা বুঝতে চায় বা এটা ওটা জানতে চায়, ডাব্বু সেখানে ব্যতিক্রম। ডাব্বু কখনো কখনো রনিকে খেলতে ডাকে। কিন্তু রনি পড়ালেখা নিয়েই থাকে। রনির বাড়ি এবং ডাব্বুর বাড়ি পাশাপাশি। সে কারণে প্রায়ই সকাল-বিকালে ডাব্বু রনিদের বাড়িতে যায়। আর ঘুরাঘুরি করাই তো ডাব্বুর স্বভাব। রনির মা অবশ্য ডাব্বুকে পছন্দ করেন খুব। দোকান থেকে এটা ওটা কিনে দেওয়ার কাজে খুবই বিশ্বস্ত ডাব্বু। রনির মাকেও ডাব্বুর খুব ভালো লাগে। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে রনির ছোটোভাই জনিকে। ও একটু একটু করে কথা বলতে পারে। উঠানে ছোটো ছোটো পায়ে দৌড়াতে পারে। আর কারো আঙুল মুখে পুড়ে কামড়ে দিতে পারে। জনি ডাব্বুকে পেলে ছাড়বেই না। সারাক্ষণ ডাব্বুর কোলে কোলে থাকবে। আর বলবে, দাব্বু ভাইয়া দাব্বু ভাইয়া, তুমি আমাল কাছে তাকো। জনির এ কথা আর ফেলতে পারে না ডাব্বু। আসলে ডাব্বু কারো কথাই ফেলতে পারে না।

ডাব্বুর আরেক বন্ধু ও ক্লাসমেট অয়ন। অয়ন বড্ড চুপচাপ। প্রায় বন্ধুহীন। মা হারা অয়ন কথা বলে কম। কোনো হই-হুল্লোড় তার পছন্দ না। তবুও ডাব্বুকে পেলে তার কিছু কিছু কথা হয়। তখন ভালো লাগে অয়নের। অয়নের বাবা দিনমজুর। ভোরে ছেলেকে খাইয়ে কাজে চলে যায়। সন্ধ্যার পর নিজ হাতে রান্না করে ছেলেকে খাওয়ায়। এ খবর ক্লাসের কেউ জানে না, শুধু জানে ডাব্বু।

ডাব্বু স্কুলে গেলে প্রতিদিন টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে যায়। পুডিং, কলিজা-সিঙারা, পিঠা এসব নিয়ে গেলে ডাব্বুর খাবার সবাই কেড়েকুড়ে খায়। আর ডাব্বুও সকলকে না দিয়ে খেতে পারে না। তবে ডাব্বুর বেশি আনন্দ লাগে অয়নকে দিতে পারলে। ডাব্বুর মা জানে। ছেলেকে বেশি পরিমাণে খাবার না দিলে ছেলে উপোসই থাকবে। তাই ডাব্বুর বন্ধুদের কথা মাথায় রেখে তার মা তাকে প্রতিদিন বেশি করে খাবার দেয়। টিফিন আওয়ারে অয়ন কোথায় কোথায় যে চলে যায়। ডাব্বু তাকে খুঁজে এনে খাবার দেয়। কোনোদিন খিচুড়ি, কোনোদিন বিরিয়ানি বা অন্য কিছু। অয়নকে খাবার দিতে দিতে ডাব্বু কপট ধমক দিয়ে বলে-টিফিন আওয়ারে কই যাস ফাজিল।

: রোজ রোজ তোর খাবার খেতে আমার বুঝি লজ্জা করে না। জবাব দেয় অয়ন।

: লজ্জা কীসের অয়ন? তোকে নিয়ে খেতে যে আমার ভালো লাগে। তুই কি বুঝিস না? আবার বলে ডাব্বু।

: বুঝি তো। আমি যে তোকে খাওয়াতে পারি না। অয়নের কথা শেষ না হতেই ডাব্বু বলে-

: আর খাওয়াতে হবে না। নে খা।

দু'জনে খেতে থাকে পরম তৃপ্তিতে।

ডাব্বুর মানুষ ভালো লাগে, গাছপালা ভালো লাগে, প্রকৃতি ভালো লাগে। ভালো লাগে এ চমৎকার পৃথি বীটা। স্কুল থেকে যেতে যেতে ডাব্বু গাছপালা দেখে, অরণ্য দেখে, সবুজ মাঠ দেখে। দিঘির টলটলে জল

দেখে, তার দু'চোখ ভরে যায়। নিসর্গ তার ভালো লাগে, আকাশ ভালো লাগে। দুপুরে জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে তো ভীষণই ভালো লাগে। বৃষ্টির দিনে আকাশে মেঘের ওড়াওড়ি, কালো-সাদা-ধূসর রংয়ের মেঘের আনাগোনা তাকে মুগ্ধ করে। কখনো কখনো আকাশে চিল উড়তে দেখা যায়। ডাব্বুর তখন চিল হতে ইচ্ছে করে। পাখি হতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পাখি হলে কী মজাটাই না হতো। মেঘেদের সাথে মিতালি করা যেত। দূরের পাহাড়ে ঘুরে আসা যেত। পরির দেশে যাওয়া যেত। চাঁদের বুড়িকে দেখে আসা যেত।

এবার ডাব্বুর পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালোই। পরীক্ষার আজ শেষ দিন। রনি আর ডাব্বু হেঁটে যাচ্ছে স্কুলে। পরীক্ষার আর আধ ঘণ্টা বাকি। তাই দু'জনে একটু জোরেই হেঁটে চলছে। আয়েশাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেই ওরা দেখে মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি। আয়েশাদের মূলঘর ও গোয়াল ঘরে আগুন লেগেছে। দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। ডাব্বু দৌড়ে যায় ওই বাড়িতে। কলম, পেনসিল বক্স একদিকে ছুড়ে ফেলে ডাব্বু আগুন নেভাতে শুরু করে। ডাব্বুর নজরে পড়ে গোয়াল ঘরে গাভিটি চিৎকার করছে। এক দৌড়ে পাশের ঘর থেকে দা এনে গোয়াল ঘরে ঢুকে ডাব্বু। দড়িটি কেটে দেয়। জোরে কাটতে গিয়ে দা এসে লাগে তার পায়ে। পা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ডাব্বুর সেদিকে নজর নেই। ডাব্বু বালতিতে করে পানি এনে আয়েশাদের দুটি ঘরের আগুন নেভাতেই ব্যস্ত। সকলের প্রচেষ্টায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এতক্ষণে সকলের দৃষ্টি যায় ডাব্বুর পায়ের দিকে। সালাম চাচা ও আবুল ভাই ডাব্বুকে নিয়ে যায় বাজারের মিজান ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তার পায়ে ব্যান্ডেজ করে। ডাব্বুর মনে পড়ে যায় পরীক্ষার কথা।

আবুল ভাই একটি রিকশা ঠিক করে তাকে নিয়ে দ্রুত স্কুলে চলে যায়। ততক্ষণে পরীক্ষার আর মাত্র এক ঘণ্টা বাকি। স্কুলে এ খবর আগেই পৌঁছে গেছে। রনি জানিয়েছে স্যারদের। স্যাররা ডাব্বুর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। পরীক্ষার আর এক ঘণ্টা বাকি থাকলেও ডাব্বু পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়। এতেই ধন্য ডাব্বু। শিক্ষকরা বলেন ধন্য ছেলে ধন্য, এদেশ তোমার জন্য, ডাব্বু তোমার জন্য। পরীক্ষার হলে এখন গভীর নিমগ্ন ডাব্বু। ■

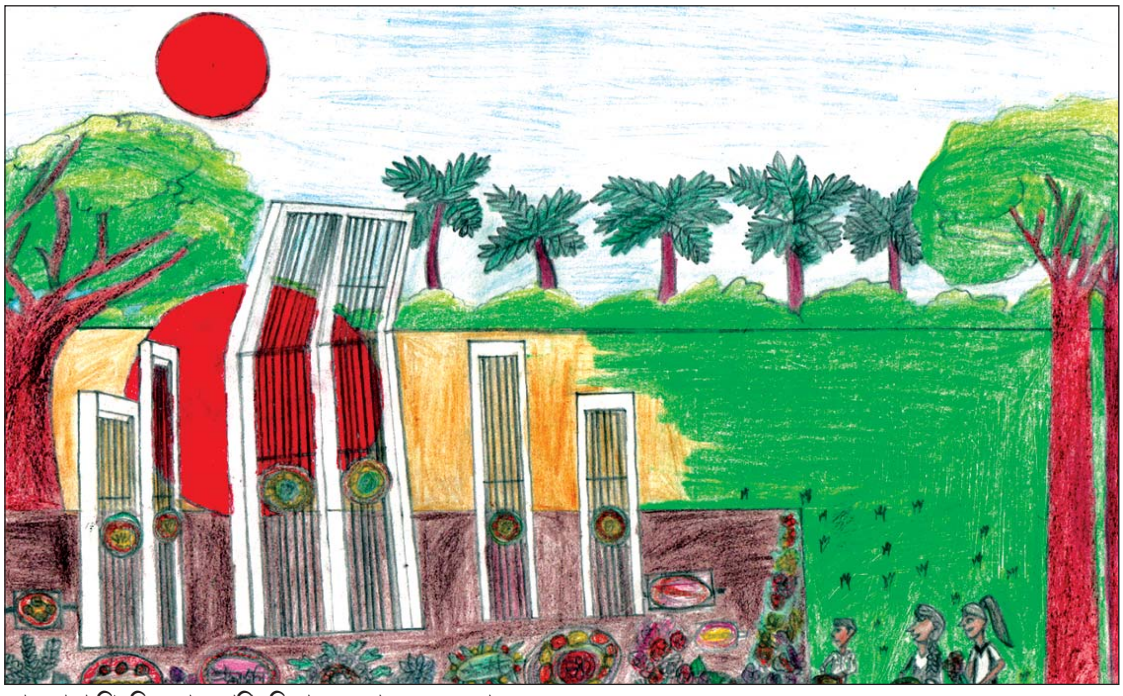

তাসনোভা প্রিয়ন্তি, দশম শ্রেণি, ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

আমার বর্ণমালা আমার অহংকার

অ
অপরাজেয় বাংলা

আ
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ই
ইলিশ

ঈ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উ
উৎসব

ঊ
ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ঋ
ঋতু

এ
একুশে ফেব্রুয়ারি

ঐ
ঐতিহ্য

ও
ওষুধপত্র

ঔ
ঔপনিবেশ

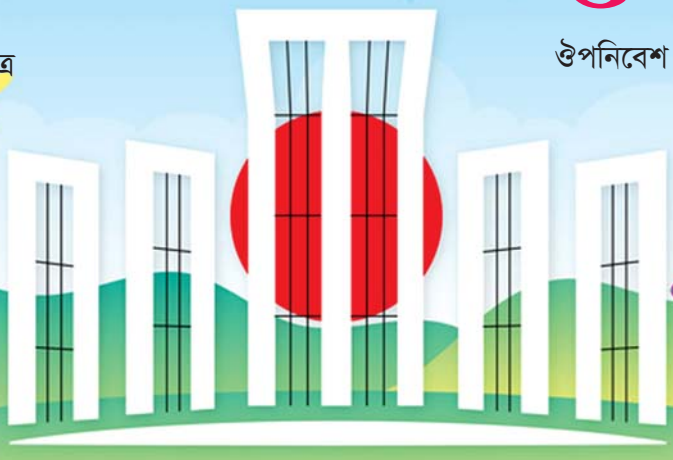

অমর একুশে

ক
কাজী নজরুল ইসলাম

খ
খালবিল

গ
গীতাঞ্জলি

ঘ
ঘুড়ি উৎসব

ঙ
বাঙালি

চ
চলনবিল

ছ
ছয় দফা

জ
জামদানি

ঝ
ঝালমুড়ি

ঞ
মিঞা

ট
টাকা

ঠ
ঠেলাগাড়ি

ড
ডাকঘর

ঢ
ঢাকা

ণ
হরিণ

ত
তিতুমীর

থ
থানকুনি

দ
দেশ

ধ
ধলেশ্বরী নদী

ন
নববর্ষ

প
পিঠা উৎসব

ফ
ফল

ব
বাংলাদেশ

ভ
ভাষা আন্দোলন

ম
মুজিবনগর

য
যাত্রাপালা

র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ল
লাল-সবুজের পতাকা

শ
শেখ মুজিবুর রহমান

ষ
ষড়ঋতু

স
স্বাধীনতা

হ
হাসনরাজা

ড়
আমড়া

ঢ়
আষাঢ়

য়
জয়নুল আবেদীন

ৎ
মৎস্য

ং
সিংহ

ঃ
সুখ-দুঃখ

ঁ
চাঁদ

কবিতাগুচ্ছ

ইচ্ছে করে

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

ইচ্ছে করে নদী হয়ে
সাগর পানে যাই
ইচ্ছে করে পাখি হয়ে
ভোরের গান গাই।

ইচ্ছে করে অরুণ প্রাতে
তরুণ হয়ে হাসি
ইচ্ছে করে সরোবরে
পদ্ম হয়ে ভাসি।

ইচ্ছে করে চাঁদ হয়ে
আলো করি দান
গাইতে আমার ইচ্ছে করে
সোনার বাংলা গান।

পাখিপুরে

শাহাদাৎ শাহেদ

জানলার কাচে কাচে নেচে ওঠা ভোর–
ডেকে বলে : ওঠো খোকা– খুলে দাও দোর;
দরজাটা মেলে দাও বাড়িয়ে দুহাত–
এসো এসো ঘুরে আসি শৈল-প্রপাত...

আজকে দস্যি হবো, সকাল-দুপুর–
নিরিবিলি ক্ষীণপায়ে যাব পাখিপুর;
আমি-তুমি হয়ে যাব তটিনীর গান–
মুহু-মুহু পিহি-পিহি চিহি-চিহি তান...

উঁচু-নিচু পাহাড়ের কোঠরে-গুহায়
আদিম মানুষ হব;– লুকিয়ে উহায়।
বুনোফুল, ঝরাপাতা, শুকনো কাঠের
কিছুটা গন্ধ হব; খড়ি কি পাটের...

তিরতির নড়ে ওঠা নরম পাতা
হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেব, গাছের মাথা
দুলে ওঠে ঝিরিঝিরি বাতাসের আঁচে–
তুমি-আমি ছুটে যাব ওদেরও কাছে।

আমি-তুমি, তুমি-আমি, আমি-তুমি মিলে
নদী হব। মিশে রবো সাগরের নীলে;
মেঘেদের উড়োদেশে বানাব যে ঘর–
আজকে দস্যি হব হাজার কিশোর।

পহেলা ফাল্গুন

রফিকুল ইসলাম

বসন্ত এসেছে আজ পহেলা ফাগ্গুন
বুনো ফুলের সৌরভ বিলানোর সময় এখন
কোকিল ডাকার এল আয়োজন।
অকারণে সুখে অলক্ষে মেতেছে রঙে
বনে অশোক কিংশুক,
ফুলেরা উচ্ছ্বাসে হাসছে বাতাস কাঁপছে
বনে দুলছে আম্রমুকুল।
শাখায় শাখায় পত্র-পল্লবে ডেকেছে বান
মনের বেদিতে প্রজাপতি রং ফুলে ফুলে
বুলবুলি মৌমাছির গুনগুন কলতান।
অনুরণনে পলাশ-শিমুল আগুনে লালে লাল
এমন ফাগুন দিনে কে আমায় খুঁজবে !
আজ বসন্তে খুলে গেছে দখিনা দুয়ার
পুষ্পে পুষ্পে নুয়ে পড়েছে শাখা
হঠাৎ কৃষ্ণচূড়ার ডালে বেনারসি আল্পনা দেখে
পথিক উদাসী হবে বার বার।

ফাগুনের সুখ

ছাদির হুসাইন ছাদি

ফাগুন মাসে দূর্বাঘাসে
বসতে ভালো লাগে,
কৃষ্ণচূড়ার রঙের বাহার
মনের মাঝে জাগে।

কুহু সুরে গান গেয়ে যায়
ভালোবাসার কোকিল,
মুগ্ধ হয়ে সুরের তালে
নেচে উঠে দিল।

মিষ্টি হাওয়া গা রাঙিয়ে
শান্তি দিয়ে যায়,
আঁখি দুটি তৃপ্তি নিতে,
তারই পানে চায়।

মধুমাখা রাঙা আলো
সবুজ মাঠে হাসে,
পলাশ-শিমুলের সুবাসে
ভাসি ফাগুন মাসে।

নিবন্ধ

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় শিশুরা

সাবিনা ইয়াসমিন

সবাই আমরা পড়ি। বই পড়ি, পত্রিকা পড়ি, পত্র পড়ি। তবুও পড়ি। পড়ার কোনো বিকল্প নেই। কোনো কিছু জানতে হলে, বুঝতে হলে, জ্ঞান অর্জন করতে হলে পড়তেই হবে। সারা বছরই আমরা পড়ি। বছর ধরে ক্লাসের বই পড়তে পড়তে তোমরা হাঁপিয়ে ওঠো তাই না। তাই লেখকগণ ও প্রকাশকগণ মাঝে মাঝে আয়োজন করে বইমেলার। সেখানে অনেক রকম মজার মজার বই পাওয়া যায়। উৎসবমুখর পরিবেশে বই পড়া ও বই কেনার মজাই আলাদা। বাবা-মা বা বন্ধুরা মিলে বইমেলা ঘুরে, স্টলে স্টলে ঘুরে বই কেনার তুলনা নেই।

আমাদের দেশে বাংলা একাডেমিতে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ভাষার মাস ও মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মরণে বড়ো পরিসরে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা সেখানে গিয়েছ নিশ্চয়! নতুন নতুন কত বই! গল্প, কবিতা, ছড়া, কমিকস, জাদু, সায়েন্স ফিকশন, উপন্যাস, ধর্মীয় বই কী নেই সেখানে। শুধু সকাল সকাল গিয়ে ঠান্ডা মাথায় স্টল ঘুরে ঘুরে দেখে পছন্দের বইগুলো কিনে নিলেই হলো।

বাংলাদেশের মতো ভারতের কলকাতায়ও বিরাট পরিসরে প্রতিবছর বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর সল্টলেকের করুণাময়ীতে ২৯ শে জানুয়ারি থেকে ৯ই

ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। সরকারি আদেশে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনাসমূহ নিয়ে এ অধিদপ্ত থেকে আমরা ছয়জন অংশগ্রহণ করেছিলাম ঐ মেলায়। মেলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ছিল বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশের ৪০টি স্টল নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন। বাংলাদেশ দূতাবাস কলকাতার শান্তিনিকেতনে অবস্থিত বাংলাদেশ ভবনের আদলে নির্মাণ করেছিল এ বছরের বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের এমন আয়োজন দেখেই মন আনন্দে ভরে ওঠে। ভাষার মিল থাকাতে তাদের সাথে আদান-প্রদানে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। আমাদের বই তারা খুব আগ্রহ করে দেখেছে ও কিনেছে। বইমেলায় না গেলে বুঝতামই না কলকাতার মানুষ বাংলাদেশকে কতটা ভালোবাসে। যারা অতীতে এদেশের অধিবাসী ছিলেন তাদের বাংলাদেশের প্রতি আবেগ ছিল অন্যরকম।

এই ভাষার মাসে আবারো নতুন করে অনুভব করলাম যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষা যে কত বড়ো হাতিয়ার। সেই বাংলা ভাষা আমাদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রক্তের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়েছে ১৯৫২ সালে। আহ্ নিজের ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করা কী যে শান্তি!

কলকাতা বইমেলায়ও শিশুদের আগমন ছিল চোখে পড়ার মতো। বাবা-মার সাথে, বন্ধুদের সাথে শিশুরা এসেছে বইমেলায় ঘুরতে। এদেশের মতোই শিশুরা স্টলে স্টলে ঘুরে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ে দেখেছে, তারপর কিনেছে। ও দেশের শিশুদের দেখলাম তিনটি ভাষা বেশ স্বচ্ছন্দে বলতে পারে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি। বাংলাদেশের শিশুরা সময় সুযোগ করে আগামী বছরের কলকাতা বইমেলাতে তোমরাও ঘুরে আসতে পারো। ভালো লাগবে। অভিজ্ঞতা হবে অন্য দেশ দেখার। ■

বাঘ-হরিণের বিয়ে

আল আমীন হুসাইন

বনের রাজা সিংহ মামা
পাহাড়পুরের টিয়ে,
বাঘ-হরিণের সন্ধি হলে
কালই তাদের বিয়ে।

সেই বিয়েতে বাজবে সানাই
গান যে গাইবে ব্যাঙ,
হুলো বিড়াল, ইঁদুর ছানা
নিয়ে আসবে গ্যাং।

হুক্কাহুয়া শিয়াল মশাই
নাচবে সকল কুকুর,
চামচিকারা আসবে খেতে
হবে যখন দুপুর।

বাংলা ভাষা

তানজিনা আক্তার

বাংলা ভাষায় কথা বলে
জুড়ায় আমার প্রাণ
যাঁদের জন্য বাংলা পেলাম
তাঁদের জানাই শ্রদ্ধা ও সম্মান।

বাংলায় লিখি আমি
বাংলায় গাই গান
যতদিন বেঁচে থাকব
রাখব বাংলা ভাষার মান।

৮ম শ্রেণি. মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারি

বই নিয়ে মজার তথ্য

শাহানা আফরোজ

- হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে ৪ খানা বই আছে যা মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা
- মাথাপিছু বই পাঠের দিকে শীর্ষে হলো আইসল্যান্ড
- বই পড়া মানুষের অ্যালজাইমার রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম
- ব্রাজিলের কারাগারে প্রতি একটি বই পাঠের জন্য ৪ দিন সাজা মওকুফ হয়
- ভার্জিনিয়া উলফ তাঁর সব বই দাঁড়িয়ে লিখেছিলেন
- রুজভেল্ট প্রতিদিন গড়ে ১ টি বই পড়তেন
- শুধুমাত্র দাবা খেলার উপরই প্রায় ২০০০০ বই আছে
- ভিক্টর হুগো (যুগো)'র লা মিজারেবল বইয়ে একটি বাক্য আছে। যেখানে ৮২৩টি শব্দ
- বিশ্বের যে তিনটি বই আজ অবধি সর্বোচ্চ পঠিত হয়েছে, তা হলো পবিত্র বাইবেল, মাও সেতুং-এর উক্তি ও হ্যারি পটার
- হারি (Hurry) এডিকশন (Addiction) এসব শব্দ শেক্সপিয়ারের আবিষ্কার
- নোয়াহ ওয়েবস্টার তাঁর প্রথম ডিকশনারি লিখতে সময় নিয়েছিলেন মাত্র ৩৬ বছর
- বিশ্বের বৃহত্তম লাইব্রেরি হলো লাইব্রেরি অব কংগ্রেস। ৭০ মাইল বেগে একটি গাড়ি চালিয়ে গেলে লাইব্রেরির বইগুলো পার হতে সময় লাগবে ৮ ঘণ্টা
- বিশ্বের সব থেকে বেশি বিক্রিত বইটির নাম 'এ টেল অব টু সিটিজ'। লন্ডন এবং প্যারিস নিয়ে এই বইটি লিখেছিলেন চার্লস ডিকেন্স
- বিশ্বের বৃহত্তম বইয়ের দোকানটি রয়েছে নিউইয়র্কে। দোকানটির নাম 'বার্নস এন্ড নোবল'। দোকানের বইয়ের তাকগুলো একটার পর একটা সাজালে দৈর্ঘ্য হবে ১২ মাইলের মতো
- ইংরেজিতে ছাপা প্রথম বইয়ের নাম ছিল 'দি রেকুইয়েল অব দি হিস্টোরিয়েস অব ট্রয়' (The Recuyell of the Historyes of Troye)। এই বইটি ছাপা হয় ১৪৭৫ সালে আর লেখক ছিলেন উইলিয়াম ক্যাক্সটন
- জার্মানির গুটেনবার্গ ১৪৪০ সালে মুভেবল টাইপ উদ্ভাবন করেন। ১৪৫৫ সালে এই ছাপাখানায় তিনি ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল ছাপেন। এটিই বিশ্বের প্রথম মুদ্রিত বই
- পুরনো বইয়ের গন্ধ শুঁকতে অনেকেরই ভালো লাগে। এই ভালো লাগা বা ভালোবাসার রোগকে বলা হয় 'বিবলোসমিয়া'
- যেসব পোকা বইয়ের বাঁধাই কেটে খেয়ে জীবনধারণ করে, তাদের অনুকরণ করেই 'বইয়ের পোকা' শব্দযুগল বই পড়ুয়াদের জন্য ধার নেওয়া হয়েছে
- বিশ্বের সবচেয়ে দামি বইয়ের নাম ১৬৪০ বে সাম, যা বিক্রি হয়েছে ১৪ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলারে
- বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বই হলো দ্য ক্লেংক এটলাস, যার দৈর্ঘ্য ১ দশমিক ৭৫ মিটার এবং প্রস্থে এটি ১ দশমিক ৯০ মিটার চওড়া। ■

সূত্র : ইন্টারনেট

স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনা

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

যাদের চোখের দৃষ্টি নেই তারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নয় তারা হচ্ছে দৃষ্টিজয়ী। এই দৃষ্টিজয়ীদের নিয়ে মহৎ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ করেছেন দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন শিশুতোষ লেখিকা নাজিয়া জাবীন। তিনি ২০০২ সালে একটি বই প্রকাশ করেন তখন দৃষ্টিজয়ী অনেক শিশু আসে। কিন্তু তারা তো বই পড়তে পারে না। তাই তাদের সুযোগ করে দিতেই নাজিয়া জাবীন প্রতিষ্ঠা করেন স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনা।

ব্রেইল কোনো ভাষা নয়। এটি একটি লিখার পদ্ধতি। দৃষ্টিহীনদের লেখাপড়ার স্বার্থে যে ব্যক্তি এ পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর নাম লুই ব্রেইল। তাঁর জন্ম ১৮০৯ সালে। দৃষ্টিহীন এই ফরাসি বালক মাত্র ১৫ বছর বয়সে লেখার ও সহজে পাঠযোগ্য এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছেন।

লুই ব্রেইল তিন বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যাবার পর বিশ বছর বয়সে অন্যান্য অন্ধ ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা দিতে এগিয়ে আসেন। ১৮২৭ সালে তিনি প্রথম ব্রেইল পদ্ধতির বই প্রকাশ করেন।

৪ঠা জানুয়ারি বিশ্ব ব্রেইল দিবস। বিশ্বের প্রতিটি দেশে বর্তমানে দিবসটি পালিত হয়। ব্রেইলের আবিষ্কারক লুই ব্রেইলের জন্মদিন ৪ঠা জানুয়ারি। তাঁকে সম্মান জানাতেই তাঁর জন্মদিনে ব্রেইল দিবস পালন করা হয়।

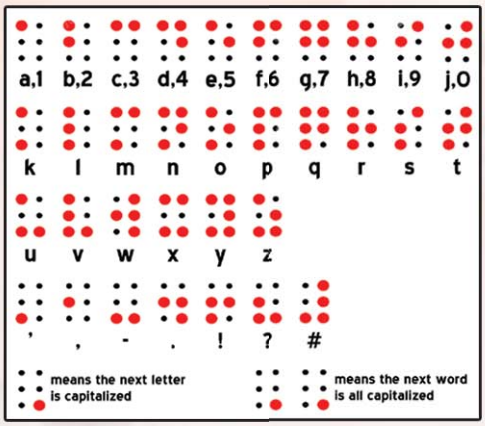

বই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনে। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয় মানুষ। বই পড়তে হলে দরকার চোখ। কিন্তু এই মহামূল্যবান চোখ যদি না থাকে তবে কী মানুষ পড়াশুনা করবে না। চোখের আলো না থাকলেও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে তাদের পাশে এসেছে স্পর্শ ব্রেইল। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলা একাডেমির বইমেলায় দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টি জয় করতে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ১৫০/১৬ নম্বর স্টল নিয়েছে স্পর্শ ব্রেইল।

স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনার স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রতিষ্ঠাতা নাজিয়া জাবীনের একান্ত ইচ্ছা বাংলাদেশের সব প্রকাশনা যেন দৃষ্টিহীনদের জন্য তাদের মতো করে বই প্রকাশ করে। স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনা দৃষ্টিজয়ীদের জন্য এবার ৮টি নতুন বই প্রকাশ করেছে। স্পর্শ করে পড়া নতুন বইগুলোর মধ্যে আছে ও হ্যানরীর 'দ্য গিফট অব দ্য ম্যাজাই' 'তামান্না হাফিজের 'আরশির কাকতাড়ুয়া' মুনতাসীর মামুনের 'ঢাকার কথা' নাজিয়া জাবীনের 'বনভোজন' আনোয়ার সৈয়দ হকের 'আমার মা সবচেয়ে ভালো' আনিসুজ্জামানের 'কত কাল ধরে' আশিক মুস্তফার '১৯৭১ বিচ্ছু বাহিনী' ইত্যাদি।

এছাড়া স্পর্শ ব্রেইল এ পর্যন্ত ৮১টি বই ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছে। প্রতিবছর স্পর্শ ব্রেইল প্রকাশনা দৃষ্টি জয়ীদের জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণ করে। প্রতিদিন স্পর্শ ব্রেইলের স্টলে স্কুল পড়ুয়া থেকে মাস্টার্স পড়ুয়া দৃষ্টিজয়ীরাও বই পড়তে আসেন। স্পর্শ ব্রেইল বর্তমানে ১৫০ টাকা মূল্যের 'জল পড়ে পাতা নড়ে' নামের মাসিক শিশুতোষ একটি পত্রিকা প্রকাশ করছে। ■

অটোগ্রাফের গল্প

বিএম বরকতউল্লাহ্

বইমেলাতে হঠাৎ করেই কৌতূহলের একটা ঢেউ খেলে গেল।

এক ছড়াকার মেলার ভিড় ঠেলে ছুটাছুটি করছেন। তিনি ডানে-বামে-উপরে-নিচে কী যেন খুঁজে ফিরছেন। তাঁর গায়ে বোতাম খোলা কোটটা প্রায় পড়ে যাচ্ছে–বারবার টেনে তুলছেন। ভিড়ের মধ্যে পিঠ বাঁকা করে এক লোক চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ভাই কী হয়েছে? আপনি এমন ছুটাছুটি করছেন কেন?'

‘ছুটাছুটি করব না মানে? এইমাত্র বইটা স্টলে তুলেছি। বই থেকে একটা ছড়া পালিয়ে গেছে। খুঁজে পাচ্ছি না!’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ছড়াকার।

‘কী বলেন! ছড়া আবার পালায় ক্যামনে, ছড়ার কি হাত-পা আছে যে পালিয়ে যাবে?’ বলল একজন।

‘দেখুন, ছড়া যে কতটা বেপরোয়া হতে পারে তা আপনি বুঝবেন না ভাই। এর হাত-পা নেই কিন্তু পাখা গজিয়েছে, তা না হলে ছড়াটি ছদ্মবেশে মেলাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।’

‘ছড়াটা কেমন একটু খোলসা করে বলুন তো?’ মুখ বাড়িয়ে বলল আরেকজন।

‘বেজায় ত্যান্দড়, দুষ্টুর হদ্দ। ছড়াটা জন্মের সময় ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল আমাকে। তাকে গড়তে গিয়ে আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল কয়েক বার। ছন্দ মেলে তো তাল মেলে না; তাল মেলে তো মাত্রা মেলে না। বহুত চেষ্টা করে দুরন্ত এই ছড়াটা সৃষ্টি করেছিলাম।’

‘সন্তান হারিয়ে গেলে পিতামাতা যেমনটি করে আপনিও তেমনই করছেন। আপনার কষ্টটা আমরা বুঝতে পারছি ভাই। আপনি ছড়াটার একটু পরিচয় দেন, যদি পেয়ে যাই তাহলে কোলে করে নিয়ে আসব আপনার কাছে।’ সান্ত্বনা দিয়ে বলল আরেকজন।

ছড়াকার কী একটা বলতে গিয়ে আর বলতে পারলেন না; ততক্ষণে ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে গেল।

দুই

ছড়াকার মেলাজুড়ে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন কিন্তু ছড়াটিকে আর পাওয়া গেল না। অবশেষে মন খারাপ করে স্টলের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি।

এমন সময় এক লোকের হাতে ছড়ার বইটা দেখে ছড়াকারের চোখ গোল হয়ে গেল। তিনি ছুটে গিয়ে বিনয়ের সাথে বললেন, ‘ভাই দারুণ একটা বই কিনেছেন দেখছি।’

‘জি, এইমাত্র কিনলাম। আমার এই মেয়েটা ছড়ার পাগল।’

ছড়াকার মেয়েটিকে আদর করতে করতে বললেন, ‘বইটা আমার লেখা। অনেক চিন্তাভাবনা করে এই বয়সের শিশুদের জন্য লিখেছি। পড়ে দারুণ মজা পাবে। আপনি দয়া করে একটু দেখুন তো এগারো নম্বর পৃষ্ঠায় ‘পলাতক ছড়াটি’ আছে কি না।’

‘কী বলেন, ছড়া থাকবে না কেন। ও, আচ্ছা বুক বাইন্ডিং এর সময় মিসও তো হতে পারে, দেখি।’

লোকটা এগারো নম্বর পৃষ্ঠা খুলেই বললেন, ‘হ্যাঁ, আছে তো, আছে; এই যে দেখুন!’

ছড়াকার বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে ঘাড় কাৎ করে দেখলেন, সত্যি সত্যি তার ছড়াটি বইয়ের তিন নম্বর পৃষ্ঠায় আছে। তাঁর শরীর শীতল হয়ে এল।

‘বইটা নিলাম কিন্তু আপনার অটোগ্রাফ তো নেওয়া হলো না’ বলেই লোকটা ছড়াকারের সামনে মুখের হাসি আর বই মেলে ধরলেন।

ছড়াকার কাঁপতে কাঁপতে কোটের সব পকেট হাতিয়েও কলম খুঁজে পেলেন না। যাকে সামনে পেলেন তার দিকেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘ভাই, আপনার কলমটা একটু, প্লিজ।’ এক লোক কিছু না বলে কলমটা দিতেই তিনি অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে কলমটা উল্‌টো ভাবে ধরলেন।

তিন

তিনি খুব যত্ন করে অটোগ্রাফ দিলেন এবং মাথা ডানে-বামে কাত করে আবার দেখে নিলেন। অতঃপর কোথাও ‘ে’-কারের মাথাটা গোল করে দিলেন; ‘ি’-কারের শেষ অংশটা টান মেরে উপরে তুলে বাঁকা করে দিলেন এবং স্বাক্ষরের নিচে তারিখের পরে ‘খ্রিষ্টাব্দ’ লিখে দিলেন। লোকটা মুচকি হাসি দিয়ে ছড়াকারকে ‘ধন্যবাদ’ জানিয়ে চলে গেল।

ছড়াকার অটোগ্রাফ দেওয়ার আনন্দে তখনো কাঁপছিলেন। ■

গল্প

দাদুর উপদেশ

বাসু দেবনাথ

মিরন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। ভালো লেখাপড়া করে পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে নামকরা এক স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। তার পরিবারও ছিল সম্ভ্রান্ত। কিন্তু ইদানীং তার ব্যবহারে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ঘরে মা-বাবার নজর থেকে বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও তার দাদু ঠিকই বুঝতে পেরেছে। সে এখন আর বিকালবেলা খেলতে বের হয় না। ঘরে একা একা থাকে। মহল্লার অন্যান্য বন্ধুদের সাথে মিশতে চায় না। তার প্রিয় বন্ধু রাফিও এখন আসে না তাকে ডাকতে।

হঠাৎ একদিন দাদু দেখল রাফিকে বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে। দাদু রাফিকে ডাকল এবং মিরনের কী হয়েছে তা জানতে চাইল। রাফি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলল :

- দাদু, আমি সাধারণ একটা সরকারি স্কুলে ভর্তি হয়েছি। মিরন আর আমাদের স্কুল পাশাপাশি তাই কিছুদিন আগে একসাথে যাব ভেবে মিরনকে ডাকতে এসেছিলাম। মিরন আমাকে বলল, সে নাকি আর আমার সাথে স্কুলে যাবে না। এছাড়াও আমি সাধারণ স্কুলের ছাত্র, স্কুলের পোশাক ময়লা, পকেট খরচ পাই না পরিবার থেকে এমনও কিছু কথা শুনিয়ে দেয় আমাকে। আমার সাথে নাকি তার বন্ধুত্ব হয় না। এসব শুনে আমি মাথা নীচু করে চলে যাই।

তার কিছুদিন পর বিকালে মাঠে সবাই খেলতে আসলে আমি রিপনকে পাঠাই মিরনকে ডেকে নিতে। রিপন যখন তাকে ডাকতে আসলো সে তখন রিপনকেও অনেক কথা শুনিয়ে দিল। রিপন ওর কথায় খুব মনে কষ্ট পেয়েছিল।

আমরা ভালো ছাত্র না, ভালো স্কুলে পড়ি না, ভালো পোশাক-আশাক নেই বলে সে আমাদের অনেককেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। যার কারণে ওর সাথে আর কেউ কথা বলে না। সেও কারো সাথে কথা বলে না। দাদু সব বুঝতে পারল।

প্রতিদিনের মতোই মিরন সকালে প্রস্তুত হয়ে স্কুলে চলে যায়। যাওয়ার সময় আকাশ পরিষ্কার থাকায় ছাতা নিয়ে যায়নি। কিন্তু স্কুল ছুটি দিলে বাড়ি ফেরার পথেই বৃষ্টি শুরু হয়। এতে সে পুরোই ভিজে যায় এবং তার পোশাকে অনেক ময়লা লেগে যায়। যাই হোক, সে বাড়ি ফিরে পোশাক পরিবর্তন করে খাওয়া সেরে নেয়। ইতিমধ্যে দাদু তাকে ডাকল। দাদুর কাছে গেলে সে কেমন আছে? স্কুল কেমন চলছে? এসব জানতে চাইলে মিরন সুন্দরভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিল। বৃষ্টি হওয়ায় বাড়ির পাশের মাঠে রাফি ও রিপনসহ সব ছেলেরা ফুটবল খেলছে। দাদু মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল :

-দেখো মিরন সবাই খেলছে, তুমি যাচ্ছ না খেলতে?

তখন মিরন একটু নাক উঁচিয়ে বলল:

-দাদু ওরা তো আমার মতো না যে ওদের সাথে খেলব।

(সাথে সাথে সে রাফি এবং রিপনকে আরো যা বলেছিল তাও বলে ফেলল)

এসব শুনে দাদু একটু মুচকি হাসি দিয়ে বলল:

-মিরন আমার খাটের নিচে পুরানো বাক্সে একটা লোহার টুকরো আছে সেটা নিয়ে আসো তো।

মিরন দাদুর কথায় লোহার টুকরোটি নিয়ে আসলো। সম্পূর্ণ লোহাতে জং -এর আবরণ পড়ে গিয়েছে।

দাদু বলল:

-দেখো মিরন লোহার টুকরোটি কত মজবুত তাই না?

মিরন হ্যাঁ বলে মাথা নাড়ালো। তারপর দাদু বলল:

-আচ্ছা মিরন লোহাটি কি সুন্দর?

এবার মিরন না বলে মাথা নাড়ালো। দাদু বলল:

-শোনো মিরন লোহাটি অনেক মজবুত কিন্তু এটি দেখতে একটুও সুন্দর না। কারণ এটির উপর জং-এর আবরণ পড়েছে। ঠিক তেমনি একজন ব্যক্তি যতই জ্ঞানী, গুণী, ধনী হোক না কেন, যদি তার মধ্যে অহংকার থাকে তবে তাকে আর সুন্দর দেখায় না।

তাকে কেউ পছন্দ করে না। আমরা সবকিছুতে যতই বড়ো হই না কেন আমাদের কখনও অহংকার করা উচিত না।

মিরন একবারে চুপচাপ। দাদু উঠে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, চলো আমার সাথে। তারপর মিরনের স্কুলের ময়লা পোশাকের কাছে গিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলেঃ

-মিরন এগুলো এত ময়লা কীভাবে হলো?

মিরন ছোটো কণ্ঠে বলল:

-দাদু স্কুল থেকে ফেরার পথে ছাতা ছিল না। তাই না চাইতেও বৃষ্টিতে ভিজে ময়লা হয়ে গিয়েছে।

দাদু বলল:

-দেখলে মিরন ছাতা না থাকায় তুমি পরিস্থিতির স্বীকার হলে এবং না চাইতেও ভিজতে হলো তোমাকে। ঠিক এমনিভাবে এই পৃথিবীতে সবাই না চাইলেও কোনো না কোনোভাবে পরিস্থিতির স্বীকার হয়। তাই কাউকে ছোটো করে দেখা উচিত না।

এবার মিরন দাদুকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করল এবং তার ভুল স্বীকার করল । দাদু বলল, এখন তুমি কী করতে চাও। মিরন এক দৌড়ে মাঠে ছুটে গেল এবং রাফিকে জড়িয়ে ধরল। মাঠের সব বন্ধুরা দৌড়ে এসে মিরনকে জড়িয়ে ধরল। দাদু সব দেখে মুচকি একটা হাসি দিল। এরপর থেকে মিরন সব সময় দাদুর উপদেশ স্মরণ রেখে চলে। ■

গল্প

বায়োলজি স্যারের মজার ক্লাস

আব্দুর রহমান

রোকনদের বায়োলজি স্যার খুব মজা করে ক্লাস নেন। প্রতিদিন ক্লাসে মজার মজার কথা বলে ক্লাসটাকে মাতিয়ে রাখেন তিনি। রোকন একদিন ক্লাসে স্যারকে বলল, 'ঘটনা শুনেছেন স্যার? আমাদের ক্লাসের তারিকের ভাই লাউ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। মাইরও খেয়েছে অনেক।'

রোকনের কথা শুনে ক্লাসের সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে হেসে ক্লাসটাকে হই হুল্লোড় করে তুলল।

বায়োলজি স্যার ধমকের সুরে বললেন, 'এই চুপ করো সবাই। না জেনে না শুনে কি বলছ এসব?'

রোকন বলল, 'না স্যার জেনে শুনেই বলছি এগুলো।'

'কার কাছে শুনেছ?'

'আমাদের পাড়ার লোকদের কাছে। সবাই বলতেছে তারিকের ভাই নাকি মাইর খেয়ে বিছানায় পড়ে আছে।'

স্যার তখন সবাইকে বললেন, 'শোনো, তোমাদের দিয়ে আমি আজকে একটি পরীক্ষা নেব।' বলে স্যার রোকনকে একটি খাতাসহ বাইরে ডেকে নিয়ে এলেন।

ছাত্রছাত্রীরা তো সবাই হতভম্ব হয়ে গেল, কি এমন পরীক্ষা নেবে যার জন্য রোকনকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল! বাইরে নিয়ে স্যার রোকনকে বললেন, 'আমি তোমার খাতায় একটি কথা লিখে দেবো সেই কথাটি তুমি কানে কানে তোমার পাশের বেঞ্চের বন্ধুকে বলবে। সে আবার তার পাশের বন্ধুকে বলবে এবং

সে তার পাশের বন্ধুকে। এভাবে পর পর সবাই তার পাশের জনকে কানে কানে বলবে।'

রোকন উৎসাহের সাথে বলল, 'কি কথা স্যার?'

স্যার লিখে দিয়ে বললেন, 'তুমি তোমার পাশের বন্ধুকে বলবে বায়োলজি স্যার ১০টি টাকা কুড়িয়ে পেয়েছে এবং সেটি ফকিরকে দান করে দিয়েছে।'

স্যারের কথা মতো ঠিক তাই করা হলো। এক বন্ধু আরেক বন্ধুর কানে এবং সে আরেক বন্ধুর কানে এভাবে ক্লাসের সবাই পর পর পাশের বন্ধুর কানে কথাটি বলতে থাকল। শেষ জনের কাছে যে কথাটি আসলো সেটি হলো বায়োলজি স্যার ১০টাকা চুরি করেছে।

স্যার এবার হেসে দিয়ে বললেন, 'দেখেছ? আমি খাতায় লিখে দিয়েছি বায়োলজি স্যার ১০টি টাকা কুড়িয়ে পেয়েছে এবং সেটি ফকিরকে দান করে দিয়েছে। কিন্তু এই কথাটি সবার মধ্য দিয়ে আসার কারণে এটি পরিবর্তন হয়ে বায়োলজি স্যার ১০টাকা চুরি করেছে এই কথাটি আসলো। কি অদ্ভুত!'

ক্লাসের সবাই আবারো উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করল। স্যার হাসি থামিয়ে বললেন, 'ঠিক তেমনি মানুষের শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই। মানুষের শোনা কথ ার মধ্যে অনেক পরিবর্তন থাকে, তাই বলে সব সত্য নয়। যেমন একটু আগে রোকন তারিকের ভাইকে নিয়ে যেই কথাটি বলল। আসলে তারিকের ভাই লাউ চুরি করে মাইর খায়নি। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি ওদের বাসায়।'

উপদেশ: মানুষের শোনা কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নেই। ■

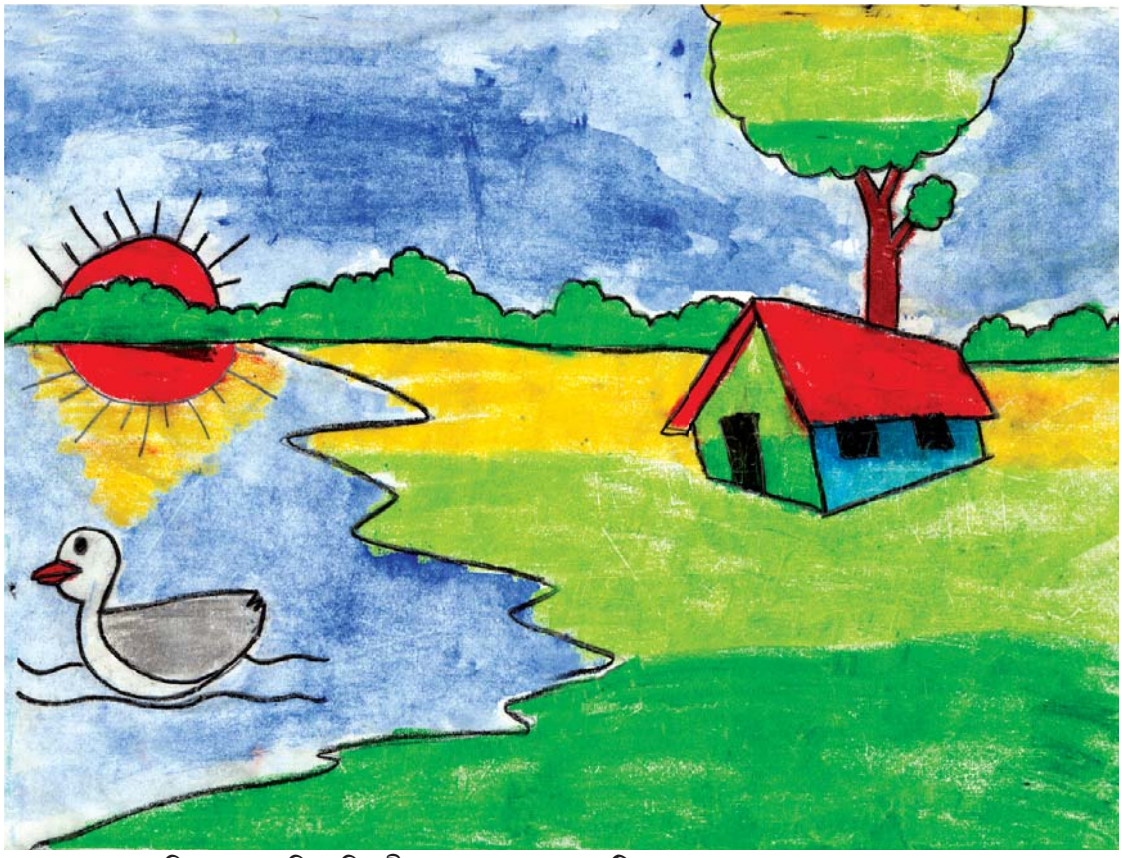

এস.এম রেহাম রামিন, প্রথম শ্রেণি, হাসিব ড্রীম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুষ্টিয়া

বিজ্ঞান

আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে

সানাউল্লাহ আল-মুবীন

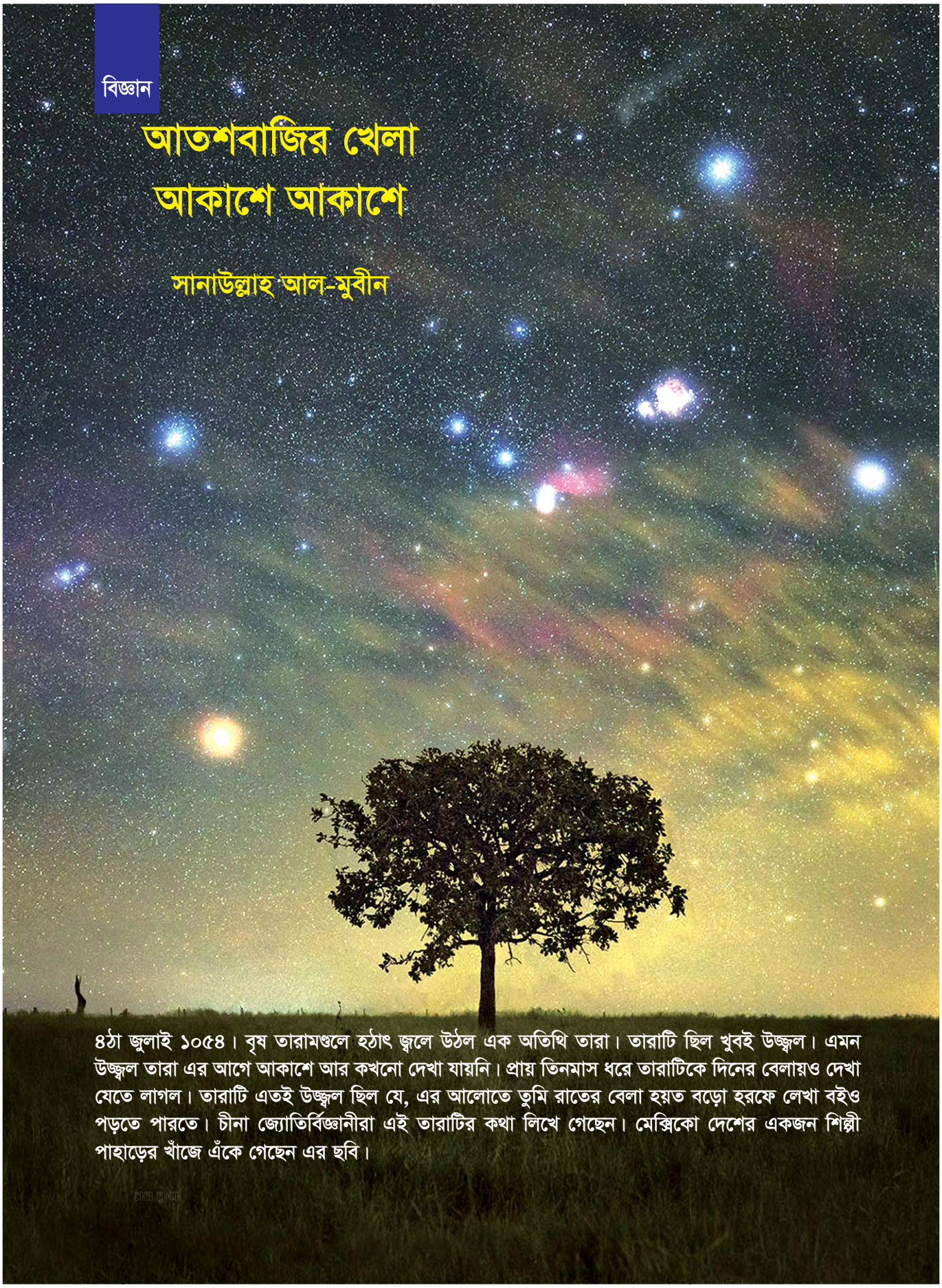

৪ঠা জুলাই ১০৫৪। বৃষ তারামণ্ডলে হঠাৎ জ্বলে উঠল এক অতিথি তারা। তারাটি ছিল খুবই উজ্জ্বল। এমন উজ্জ্বল তারা এর আগে আকাশে আর কখনো দেখা যায়নি। প্রায় তিনমাস ধরে তারাটিকে দিনের বেলায়ও দেখা যেতে লাগল। তারাটি এতই উজ্জ্বল ছিল যে, এর আলোতে তুমি রাতের বেলা হয়ত বড়ো হরফে লেখা বইও পড়তে পারতে। চীনা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই তারাটির কথা লিখে গেছেন। মেক্সিকো দেশের একজন শিল্পী পাহাড়ের খাঁজে এঁকে গেছেন এর ছবি।

আজকের বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি ছিল একটি সুপারনোভা। আমরা বাংলায় বলতে পারি অতি-নতুন তারা। অতি-নতুন তারা আসলে কোনো নতুন তারা নয়, বিশালদেহ কোনো পুরনো তারার মৃত্যুদশা। সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড়ো ও ভারী তারারা মৃত্যুদশায় গিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে, পরিণত বয়সে পাকা শিমুল ফুল যেমন ফেটে যায়। আর তখন মহাকাশে যে বিপুল অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তার আলো দেখতে পাওয়া যায় বহু লক্ষ আলোক বছর দূর থেকেও। তখন মনে হয়, আমাদের চেনা আকাশে হঠাৎ যেন এক অচেনা তারার আগমন ঘটেছে।

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা লয়ে
যুগযুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।
[রবীন্দ্রনাথ]

সুপারনোভা বা অতি-নতুন তারা মহাকাশের সবচেয়ে বড়ো তারাদের জীবনের অন্তিম দশা। এ যেন এক মহাজাগতিক আতশবাশি। সূর্যের দশ বা বিশগুণ বেশি ভরের তারারা মৃত্যুদশায় পৌঁছে সুপারনোভা হিসেবে ফেটে পড়ে। এতে যে বিপুল তেজ বেরোয়, তা সূর্যের মতো তারাদের হাজার কোটি বছরের জীবনে বিকীর্ণ মোট তেজের চেয়েও বেশি। আর আকাশে এতে এমন আশ্চর্য চমক লাগানো আলোর ফুলঝুরি সৃষ্টি হয় যে, তার রোশনাই হয়ে ওঠে আস্ত একটি গ্যালাক্সির সমান। গ্যালাক্সি হচ্ছে হাজার-হাজার কোটি তারার এক বিপুল সমাবেশ। একটি গ্যালাক্সিতে প্রতি একশ বছরে সুপারনোভা বিস্ফোরিত হতে পারে গড়ে একটি। ১৫৭২ সালে আকাশে প্রায় দশ হাজার আলোক বছর দূরে বিস্ফোরিত একটি সুপারনোভা দেখা গিয়েছিল। এটি দেখা গিয়েছিল ক্যাসিওপিয়া নামের তারামণ্ডলে। সুপারনোভাটি তাইকোর নোভা হিসেবে খ্যাত। কারণ বিখ্যাত আকাশ পর্যবেক্ষক তাইকো ব্রাহে কর্তৃক এটি বর্ণিত হয়েছে। এটি অতি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল, প্রায় শুকতারার মতো। পঁচিশ হাজার আলোক বছর দূরে আকাশে আর একটি সুপারনোভা জ্বলেছিল। ১৬০৪ সালে এটি দেখা গিয়েছিল। এটি কেপলারের নোভা হিসেবে খ্যাত। কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলার এটি বর্ণনা করে গেছেন। এটি ছিল প্রায় বৃহস্পতিগ্রহের মতো উজ্জ্বল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, যিশু খ্রিষ্টের জন্মের সময় আকাশে যে অতি-উজ্জ্বল একটি তারার উদয় হয়েছিল, ইতিহাসে যা বেথেলহেমের তারা হিসেবে খ্যাত, সেটিও ছিল একটি সুপারনোভা। কিন্তু দুরবিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের গ্যালাক্সিতে একটিও সুপারনোভা দেখা যায়নি। তবে ১৯৮১ সালে একটি সুপারনোভা দেখা যায় প্রায় পাঁচ কোটি আলোক বছর দূরের এক গ্যালাক্সিতে। ১৯৮৭ সালে বড়ো মেগেলান নামের নীহারিকায় আর-একটি সুপারনোভার বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করা গেছে। বিজ্ঞানীদের হিসেব মতে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে ইটা কারিনা নামের মৃত্যুপথযাত্রী এক বিপুলবপু তারা নিকট ভবিষ্যতে হয়ত অতি শক্তিশালী এক সুপারনোভায় পরিণত হতে যাচ্ছে। ছায়াপথে একটি সুপারনোভা দেখবেন বলে তারা কয়েকশ বছর ধরে আকাশে তাঁদের সন্ধানী চোখ মেলে রেখেছেন।

সুপারনোভা তারাদের মৃত্যুকালীন বিস্ফোরণ। প্রাণিজগতে প্রাণীদের জন্ম আছে, শৈশব-কৈশোর আছে, আছে তারুণ্য ও যৌবন এবং অবশেষে বার্ধক্য ও মৃত্যু। তারাদেরও জন্ম আছে, আমাদের মতো এরাও শিশুকাল কাটায়, যৌবনে পদার্পণ করে, বুড়ো হয় এবং একদিন মরে যায়। এদের জন্ম হয় মহাকাশের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছড়ানো হাইড্রোজেন গ্যাসের বিশাল বিশাল মেঘের মধ্যে। এদের বলে নীহারিকা। এরা যেন তারা ফোটানোর এক-একটি বীজতলা। মহাকর্ষের টানে নীহারিকার মধ্যকার গ্যাসের অণুরা একসময় পরস্পরের কাছাকাছি আসতে শুরু করে। যতই কাছাকাছি আসে, একটি অণুর সঙ্গে অন্য অণুর ঠোকাঠুকি লাগে। ফলে গ্যাসের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। যতই তাপমাত্রা বাড়ে, ততই বাড়ে তাদের ছোটাছুটির বেগ। একসময় বিপুল গ্যাস জমাট বেঁধে একটি বিশাল পিণ্ডে পরিণত হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে নীহারিকার মধ্যে। ঘুরপাক খেতে থাকা এই গ্যাসের

পিণ্ডকে বলা হয় তারার ভ্রূণ। একসময় এই ভ্রূণ পরিণত হয়, প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এর গ্যাস। এই তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজন প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় চারটি হাইড্রোজেনের পরমাণু জুড়ে গিয়ে গঠন করে একটি হিলিয়ামের পরমাণু। সঙ্গে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে একটি জ্যোতিষ্কণা ফোটন। এভাবে মহাকালের গর্ভে জন্ম নেয় একটি নক্ষত্রশিশু।

প্রত্যেক তারার মাঝে দুই ধরনের বিপরীতমুখী শক্তি কাজ করে। একটি তারার কেন্দ্রের দিকে তার নিজের মহাকর্ষের টান, অন্যটি তার শক্তিপ্রবাহের দরুণ বাইরের দিকে ঠেলে ওঠার বেগ। শিশু নক্ষত্রের মহাকর্ষ চায় তাকে চুপসে দিয়ে আরো ছোটো ও সংকুচিত করতে। কিন্তু পরমাণুর সংযোজন প্রক্রিয়ায় তাতে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তা চায় তাকে আরো বড়ো ও প্রসারিত করতে। এই অবস্থায় তার মহাকর্ষবল ও বাইরের দিকে ঠেলে ওঠার বেগ একে-অন্যকে কাটাকুটি করিয়ে দেয়। ফলে তারাটি একটি স্থায়ী অবস্থা লাভ করে। এই অবস্থাকে তারাদের পূর্ণবস্থা বলে। পূর্ণবস্থায় এরা থাকতে পারে কয়েক লক্ষ বছর থেকে শুরু করে বহু-হাজার কোটি বছর পর্যন্ত।

তারারা দীর্ঘজীবী হবে না কি স্বল্পায়ু, তা নির্ভর করে জন্মের সময় কী পরিমাণ গ্যাস, ধূলিকণা ও অন্যান্য বস্তু তাদের গায়ে জড়ো হয়েছিল তার ওপর। মনে হতে পারে, বস্তুভাণ্ডার বেশি হলে কোনো তারার জীবনকালও বুঝি বেশি হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হিসেবটা একেবারেই উলটো। যে সব তারার বস্তুর পুঁজি কম, তারা খরচও করে কম হারে। সুতরাং এরা বাঁচে বেশি দিন। আবার যে সব তারার বস্তুর ভাণ্ডার বিপুল, তাদের জ্বালানি পোড়ানোর হারও উচ্চ। সুতরাং এরা হয় স্বল্পজীবী। আমাদের সূর্যের মতো মাঝারি আকৃতির তারারা বাঁচে সাধারণত এক হাজার কোটি বছর থেকে এক হাজার দুশ কোটি বছর পর্যন্ত। আবার প্রকজিমা সেনটৌরির মতো ছোটো তারাদের জীবনকাল হতে পারে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের চেয়েও বেশি যা প্রায় বিশ হাজার কোটি বছর। কিন্তু কোনো দৈত্যাকৃতির তারা মাত্র কয়েক লাখ বছরের মধ্যে তার সঞ্চয়ের সমস্ত পুঁজি খরচ করে ফেলে ঢলে পড়তে পারে মৃত্যুর কোলে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, তারাদের জীবনের অন্তিম দশা তিনটি যথা– সাদা বেঁটেতারা, নিউট্রনতারা ও কৃষ্ণবিবর। সূর্যের মতো কম ভরের তারাদের গর্ভে কার্বনের চেয়ে বেশি ভারী মৌলের সৃষ্টি হয় না।

কারণ এদের বুকের তাপমাত্রা কখনো কার্বনকে পুড়িয়ে অক্সিজেন সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। কার্বনের দহনের জন্য দরকার প্রায় পঞ্চাশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার। পর্যায়ক্রমে এরা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পুড়িয়ে ফেলার পর সাধারণত ফুলে-ফেঁপে উঠে এক-একটি লাল দৈত্যতারায় পরিণত হয়। একদিন শরীরের বাইরের অতি-বিস্ফোরিত খোলশ মহাশূন্যে উড়িয়ে দিয়ে এরা এক-একটি সাদা বেঁটেতারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অতি উচ্চ চাপে এদের কেন্দ্রের বস্তুপুঞ্জ কার্বনের কেলাস অর্থাৎ হিরের গোলকে পরিণত হয়।

কিন্তু সূর্যের প্রায় দেড় বা দুগুণ ভরের তারারা পরিণতি পায় ভিন্ন দশার। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গেলে এদের বাহিরমুখো চাপ মহাকর্ষের ভেতরমুখো টানকে ঠেকাতে পারে না। ফলে তারাটি চুপসে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে তারাটি এতই ঘনীভূত হয়ে ওঠে যে, এর পরমাণুসমূহের ইলেকট্রনরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রোটনদের গায়ের ওপর। ফলে এরা নিউট্রনে পরিণত হয়ে যায়। সাধারণ পরমাণুতে কেন্দ্র ও সীমান্তের ইলেকট্রনদের মাঝখানে থাকে বিশাল ফাঁকা জায়গা। কিন্তু এখানে সেই ফাঁকা জায়গা উধাও হয়ে যায়। ফলে পুরো তারাটি অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে ওঠে। আগাগোড়া নিউট্রনে ঠাসা বলে এদের বলে নিউট্রন তারা। এরা এমন ঘনীভূত ও সংহত হয় যে, এদের গায়ের এক চামচ পরিমাণ বস্তুর ওজন দাঁড়াবে হয়ত কয়েকশ কোটি টন।

সূর্যের ছয়গুণ বা তারও বেশি ভরের তারারা জীবনের অন্তিম দশায় গিয়ে হয়ে ওঠে এক-একটি কৃষ্ণবিবর বা কালো গর্ত। এদের শরীরের ভর বেশি বলে মহাকর্ষীয় ধসকে এরা কোনোভাবেই ঠেকাতে পারে না। সংকুচিত হতে হতে এদের দেহের সমস্ত ভর শেষে প্রায় একটি বিন্দুতে গিয়ে সংহত হয়। এ ধরনের অনন্য বিন্দুকে বলে কৃষ্ণবিবর। এই বিন্দুর চারপাশের মহাকর্ষক্ষেত্র এতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, কোনো কিছুই সেখান থেকে বেরোতে পারে না, এমনকি আলোর মতো মহাশক্তিধর ও অতি দ্রুতগতির বিদ্যুৎচুম্বক তরঙ্গও না, যা মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে সেকেন্ডে প্রায় তিন লাখ কিলোমিটার বেগে। সেটি তখন মহাবিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়।

মহাবিশ্বের অতিকায় তারারা যখন সুপারনোভা হয়ে ফেটে পড়ে, তখন তাদের শরীরের বেশির ভাগ পদার্থ – কার্বন, সিলিকন, লোহা ইত্যাদি শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অক্ষতভাবে থেকে যেতে পারে একটি উত্তপ্ত অতিপরমাণুর মজ্জা। সেই মজ্জায় বস্তুপুঞ্জ পরমাণু হিসেবে থাকে না, ইলেকট্রন বা প্রোটন হিসেবেও না, থাকে কেবল নিউট্রন হিসেবে। অর্থাৎ অতিপরমাণুর মজ্জাটি তখন আকাশে একটি নিউট্রন তারা হিসেবে বিরাজ করে। অত্যন্ত ঘন ও সংহত সেই নিউট্রন গোলক নিজের অক্ষের ওপর প্রচণ্ড বেগে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় কয়েকশ বার পর্যন্ত ঘুরতে থাকে, আর ঝলকে ঝলকে তেজ বিকিরণ করতে থাকে। এ কারণে একে পালসার বা কাঁপুনে তারাও বলা হয়।

চীনা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের যে জায়গায় তাদের 'অতিথি তারা' দেখতে পেয়েছিলেন, বর্তমানে সেখানে রয়েছে একটি কালো নীহারিকা। এর নাম কাঁকড়া নীহারিকা। এটি রয়েছে আমাদের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার আলোক বছর দূরে। আকাশের প্রায় দশ আলোক বছর এলাকাজুড়ে এর ব্যাপ্তি। আঠারো শতকে বিজ্ঞানীরা এটি আবিষ্কার করেন। এটি আসলে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে যাওয়া বিপুল ভরের একটি মহাদৈত্যতারার দুর্ভাগ্যের চিহ্ন। এক হাজার বছর আগে চীনা বিজ্ঞানীরা একে অতি-উজ্জ্বল অতিথি তারারূপে দেখতে পেয়েছিলেন। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তিতে-এর বস্তুপুঞ্জ এখনো দশদিকে ছড়িয়ে পড়ছে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার বেগে। যে দৈত্যতারা সেদিন ফেটে পড়েছিল, তার হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ অতি পারমাণবিক মজ্জাটি একটি নিউট্রন তারা হিসেবে এখনো অক্ষত আছে সেখানে। ১৯৬৭ সালে বিজ্ঞানীরা এটি আবিষ্কার করেছেন। এর ব্যাস প্রায় ৩০ কিলোমিটার, মোটামুটি একটি মাঝারি গ্রহাণুর মতো, কিন্তু ভর আমাদের সূর্যের প্রায় দিগুণ। তারাটি অত্যন্ত দ্রুতবেগে সেকেন্ডে প্রায় ৩০ বার নিজের অক্ষের ওপর ঘুরছে।

কোনো অতিকায় তারা সুপারনোভা হয়ে ফেটে পড়ার

পরও কখনো কখনো তার অতিপরমাণুর মজ্জাটি সূর্যের তিনগুণের বেশি ভর নিয়ে অক্ষত থেকে যায়। মহাকর্ষ তার ওপর তখন এমন অকল্পনীয় ধস নামায় যে, নিউট্রন তারার পর্যায় পেরিয়ে সেটি এগিয়ে যায় কৃষ্ণবিবর হওয়ার পথে। একসময় তার সমস্ত ভর ধসে পড়ে একটি অনন্য বিন্দুতে গিয়ে। সেই বিন্দুর চারপাশে রচিত হয় ঘটনারেখা নামে মহাকর্ষের এক প্রবল শক্তিশালী ফাঁদ, যেখানে কোনোকিছু একবার পড়লে আর রক্ষে নেই। কৃষ্ণবিবরের অনন্য বিন্দুতে বা ঘটনা রেখার ওপারে কী ঘটে, তা জানা যায় না। কারণ ঘটনা রেখার ফাঁদ গলে কোনো সংকেত বেরিয়ে আসতে পারে না। এমনকি আলোর সংকেতও না। মূলত সমস্ত ঘটনা ওই ফাঁদে আটকে যায় বলেই এর নাম ঘটনা রেখা।

বিজ্ঞানীরা বলেন, তারারা রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো। ফিনিক্স পাখি যেমন নিজের পোড়া ছাই থেকে আবার জীবিত হয়ে ওঠে, তারারাও তেমনই নিজেদের পোড়া ছাই থেকে পুনরায় জেগে উঠতে পারে। একটি তারা শক্তি উৎপাদন করে পরমাণুর সংযোজন প্রক্রিয়ায়, জ্বালানি পুড়িয়ে। এর প্রাথমিক জ্বালানি হচ্ছে হাইড্রোজেন। শিশু তারাদের কেন্দ্রে তাপমাত্রা যখন প্রায় এক কোটি ডিগ্রিতে ওঠে, তখন সেখানে পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া শুরু হয়। এতে হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়াম তৈরি হয়, সঙ্গে বিপুল পরিমাণ শক্তি। কোনো তারা যখন তার কেন্দ্রের সমস্ত হাইড্রোজেন পুড়িয়ে ফেলে, তখন সেখানে থাকে তার ছাই হিলিয়াম। হাইড্রোজেনের সংযোজন বন্ধ হয়ে যায় বলে কমে যায় তারাটির বাইরের দিকে ঠেলে ওঠার বেগ। কোনো বাধা না পাওয়া ভেতরমুখো মহাকর্ষ বল তখন হাইড্রোজেনের ছাইকে সংকুচিত করে। ফলে আবার বাড়তে শুরু করে তার তাপমাত্রা। একসময় সেখানে তাপমাত্রা উঠে যায় দশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসের কোটায়। এই তাপমাত্রায় শুরু হয় পরমাণু সংযোজনের পরবর্তী প্রক্রিয়া। হিলিয়াম তখন পরিণত হতে থাকে কার্বনে।

আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখতে পাই, সবকিছুর মূল উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। এগুলো মহাবিশ্বে এসেছে সৃষ্টির প্রথম উষায় মহাবিস্ফোরণে। অন্য ভারী পরমাণুগুলো সৃষ্টি হয়েছে কোনো না কোনো নক্ষত্রের গর্ভে। নক্ষত্র হচ্ছে এক ধরনের মহাজাগতিক উনুন, যেখানে অতি-উচ্চ তাপে হালকা পরমাণু সংযুক্ত হয়ে গঠিত হয় অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণু। সেখানে হাইড্রোজেন পুড়ে সৃষ্টি হয় হিলিয়াম, হিলিয়াম পুড়ে কার্বন, কার্বন পুড়ে অক্সিজেন এবং এভাবে ধাপে ধাপে সৃষ্টি হয় নিয়ন, ম্যাগনেশিয়াম, সিলিকন ও লোহা। দুটো সিলিকন পরমাণু, যাদের রয়েছে আটাশটি করে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন, কয়েকশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংযুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে একটি লোহার পরমাণু। এতে থাকে ছাপ্পান্নটি করে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন।

তারারা রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো। ফিনিক্স পাখি যেমন নিজের পোড়া ছাই থেকে আবার জীবিত হয়ে ওঠে, তারারাও তেমনই নিজেদের পোড়া ছাই থেকে পুনরায় জেগে উঠতে পারে।

তারার বুকে লোহার পরমাণু তৈরি হয় পরমাণু সংযোজন বিক্রিয়ার শেষ ধাপে। একে নক্ষত্রচুলোর শেষ ধাপের ছাই বলা যেতে পারে। জ্বালানি হিসেবে তা আর কাজে আসে না। তারার কেন্দ্রে তখন হঠাৎ পরমাণু সংযোজন বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় বলে আর শক্তি সৃষ্টি হতে পারে না। ফলে তার কেন্দ্র বস্তু ভীষণ চুপসে যেতে থাকে। কিন্তু বাইরের স্তর তখনও জ্বলতে থাকে কোটি কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। এই অবস্থায় কেন্দ্র ও বাইরের স্তরের মধ্যে ভারসাম্য না থাকায় তারাটি বিপুল বিস্ফোরণে চুরমার হয়ে যায়। খান খান হয়ে প্রচণ্ড বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তার পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা। বিজ্ঞানীরা

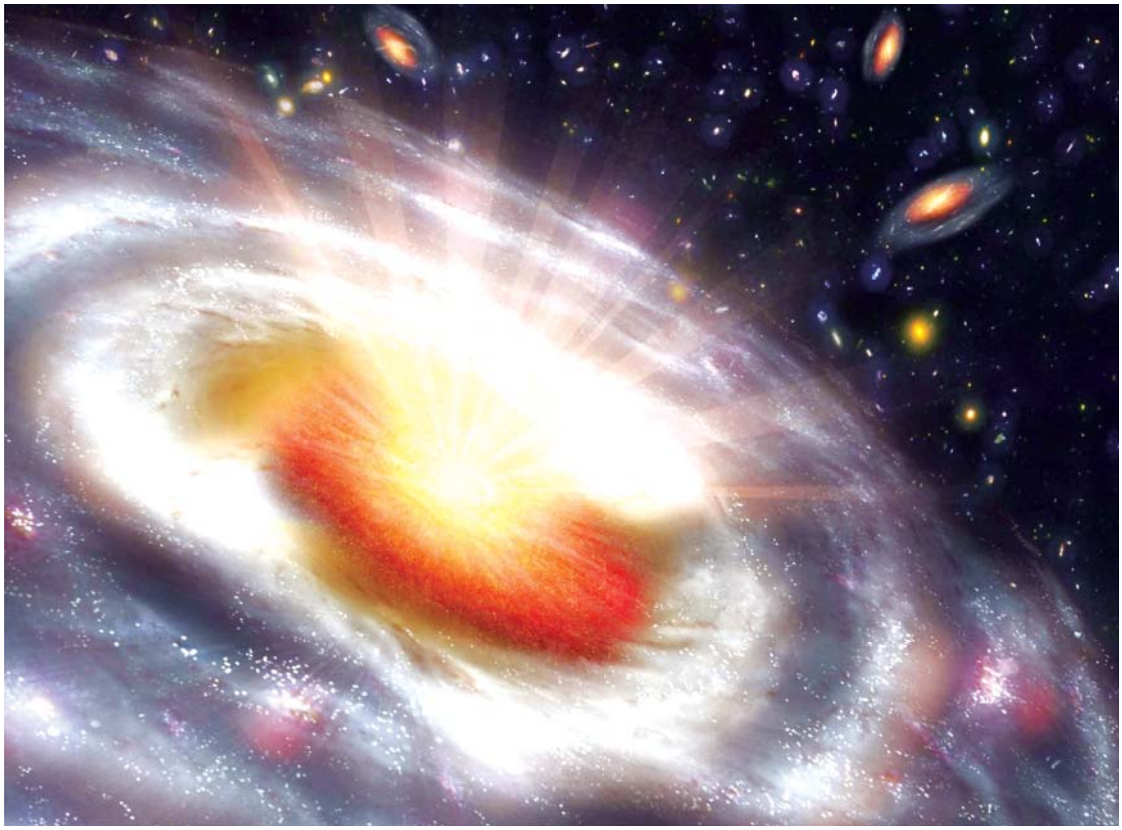

বলেন, এই মহাজাগতিক আতশবাজিতে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তাতেই সৃষ্টি হয় লোহার চেয়ে ভারী মৌলগুলো। যেমন স্বর্ণ, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি। তাঁরা আরো বলেন, পৃথিবীতে এগুলো এসেছে আমাদের সৌরজগৎ গঠিত হওয়ার আগে মহাকাশে অনেক সুপারনোভা বিস্ফোরিত হয়েছিল বলে।

কখনো কখনো সম্পূর্ণ মরা তারারাও নতুন জীবন পেতে পারে। এদের বলে নোভা নতুন তারা। নতুন তারা জ্বলে ওঠে সাধারণত জোড়াতারা ব্যবস্থায়। জোড়াতারা হচ্ছে দুটো তারার একটি জোড়। এদের একটি যদি হয় লাল দৈত্যতারা, এবং অন্যটি সাদা বেঁটে তারা, তবে অতি বিস্ফোরিত লাল দৈত্যের আবহমণ্ডল থেকে প্রচণ্ড বেগে গ্যাসের স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে অতি ঘনীভূত সাদা বেঁটে তারার দিকে। এগুলো জড়ো হয় তার গায়ে, সংকুচিত হয় তার প্রবল মহাকর্ষের টানে। উচ্চচাপে এই গ্যাস একসময় এতটাই তেতে ওঠে যে, সেখানে আবার শুরু হয়ে যায় পরমাণু সংযোজন বিক্রিয়া, এবং জ্বলে ওঠে উজ্জ্বল হয়ে। জীবন ফিরে পায় প্রায় নিভে যাওয়া একটি তারা। সূর্যের মতো একটি মাঝারি গড়নের তারা পুরো এক বছরে যে আলো মহাকাশে ছড়ায়, একটি নোভা বা নতুন তারা এক সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে দিতে পারে তার চেয়ে বেশি আলো।

সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমেও জন্ম নিতে পারে নক্ষত্রশিশু। কোটি কোটি আলোকবছর দূরে একটি তারা হয়ত বিস্ফোরিত হয়ে নিজেকে ধ্বংস করে। তাতে সৃষ্টি হয় অতি-উচ্চশক্তির মহাজাগতিক কণা ও রশ্মি। এগুলো কোটি কোটি বছর ধরে বয়ে চলে মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে। হয়ত কোনো একদিন তার ঢেউ গিয়ে লাগে বহু দূরের কোনো কুয়াশায়। তাতে ঘূর্ণি তোলে এবং হয়ত তার গ্যাসের ঘনত্ব এতে এমনভাবে বেড়ে গেল যে, গ্যাস যথেষ্ট সংকুচিত হয়ে শুরু হয়ে গেল অন্য একটি নক্ষত্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের সূর্যের জন্ম হয়েছে এভাবেই। এটি একটি

দ্বিতীয় বা তারও পরবর্তী প্রজন্মের নক্ষত্র। আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখতে পাই – ফুল, পাখি, প্রজাপতি, নদী, অরণ্য সবই এসেছে নক্ষত্র সৃষ্টির একাধিক চক্রের ভেতর দিয়ে। পৃথিবীতে আমার বা তোমার আসা সম্ভব হয়েছে মহাকাশে বিশাল তারারা একদিন নিজেদের উৎসর্গ করেছিল বলে।

সূর্যের চারপাশে গ্রহজগতের সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে রয়েছে আকাশে দাউ-দাউ করে জ্বলা অতিকায় দৈত্যতারারা। পূর্ব প্রজন্মের তারারা আকাশে একদিন এভাবে জ্বলেছিল বলেই মহাবিশ্বে সৃষ্টি হতে পেরেছে ভারী মৌলসমূহ। আমাদের এই সুষমাভরা পৃথিবীর উপাদানসমূহ, এমনকি আমাদের দেহের নানা উপাদান যেমন– কার্বন, নাইট্রোজেন, ক্যালশিয়াম, লোহা ইত্যাদি সুদূর অতীতে সৃষ্টি হয়েছিল কোনো দৈত্যতারার বুকে। বড়ো-বড়ো তারারা আকাশে না জ্বললে এই মহাবিশ্বে কার্বনের চেয়ে ভারী কোনো মৌলের দেখা মিলত না। তখন পৃথিবীর চেহারা আজকের মতো হতো না, আজকের মতো জীবজগতের বৈচিত্র্যও তখন সম্ভব হতো না। যে অক্সিজেন আমরা প্রশ্বাসে টেনে নেই, তা একদিন সৃষ্টি হয়েছিল তারার কেন্দ্রের বিপুল তাপ ও চাপের মধ্যে। আমাদের শরীরের ডিএনএ-তে আছে নাইট্রোজেন, তন্তুতে কার্বন, রক্তকণিকায় লোহা, দাঁত ও হাড়ে আছে ক্যালশিয়াম। এই সবই একদিন সৃষ্টি হয়েছিল বিপুল তাপমাত্রার কোনো তারার গভীরতম প্রদেশে, পরমাণুর সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আমরা নক্ষত্রের সন্তান। তারাপোড়া ছাই দিয়ে তৈরি আমাদের দেহ। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় এই বৈজ্ঞানিক সত্যটির প্রতিধ্বনি শোনা যায়। *পত্রপুটে*র কবিতায় তিনি লিখেছেন:

বলি, হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু-পরমাণু।

বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাকাশে প্রতি সেকেন্ডে কয়েকশ তারা নোভা হয়ে জ্বলে উঠছে, অথবা সুপারনোভা হয়ে ফেটে পড়ছে। নোভা-সুপারনোভা ছাড়াও মহাবিশ্বের দিকে-দিকে অতি-উজ্জ্বল আলোর মশাল হয়ে জ্বলছে বিপুল শক্তিধর কোয়াসাররা। কোয়াসার – এই শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে 'কোয়েসি স্টেলার রেডিও সোর্স' কথাটি থেকে। এর অর্থ তারার মতো এমন বেতার উৎস। এগুলো আবিষ্কৃত হয় বিশ শতকের ষাটের দশকে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, এদের ভেতর থেকে বেতার তরঙ্গের ধারা উৎসারিত হয়। কিন্তু পরে যখন জানা গেল, এদের প্রত্যেকটি থেকে বেতার তরঙ্গ ভেসে আসে না, তখন এদের বলা হলো 'কোয়েসি স্টেলার অবজেক্ট', অর্থাৎ তারার মতো বস্তু। আগে ভাবা হতো, এরা বুঝি ছায়াপথেরই সদস্য। কিন্তু পরে এদের আলোর বর্ণ লিপি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, গ্যালাক্সিগুলোর মতো এরাও আমাদের কাছ থেকে অতি দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। এমনকি, এদের কিছু-কিছু দূরে সরে যাচ্ছে আলোর বেগের প্রায় কাছাকাছি বেগে।

কোয়াসাররা তারা নয়, তারার মতো বস্তু। ওরা আছে মহাকাশের সুদূর প্রান্তে আমাদের জানা মহাবিশ্বের প্রায় শেষ সীমানায়। তার ওপর ওরা ধাবমান প্রচণ্ড বেগে। মহাবিশ্বের প্রায় প্রান্তসীমানায় থেকেও ওরা যেহেতু গোচরীভূত হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিসীমায়, সুতরাং অন্তর্গতভাবে ওরা খুবই তেজোদীপ্ত। মহাকাশে এক হাজার সুপারনোভা একসঙ্গে জ্বলে উঠলে যে তীব্র দ্যুতি ছড়াবে, কোনো কোনো কোয়াসার তার চেয়েও বেশি উজ্জ্বল। আর ওরা এই দীপ্তি ছড়ায় আমাদের সৌরজগতের চেয়েও ক্ষুদ্র এলাকা থেকে।

মহাকাশে এ পর্যন্ত বহু কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা প্রতি মুহূর্তে বিপুল তেজ উগরে দিচ্ছে শূন্যে, ছায়াপথের মতো শত শত গ্যালাক্সির বিকীর্ণ তেজের সমান। কিন্তু মহাশূন্যে এদের এমন বিপুল শক্তি উগরে দেওয়ার কারণ কী? এরা এতো তেজ পায়ই বা কোথায়?

কোয়াসাররা আসলে কী, এবং এত বিপুল শক্তিই বা ওরা কোথায় পায়, সে সম্পর্কে এখন আমরা খুব বেশি কিছু জানি না। তবে বিজ্ঞনীরা এর কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, কোয়াসাররা হচ্ছে পালসার অর্থাৎ কাঁপুনে তারাদের বৃহৎ সংস্করণ, যাদের রয়েছে অতি শক্তিশালী

চৌম্বকক্ষেত্র, আর অনেক বড়ো এক নিউট্রন মজ্জা। অথবা ওরা হতে পারে কোনো গ্যালাক্সির অতি সংক্ষুব্ধ কেন্দ্র, যেখানে কোটি কোটি তারা প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে জড়াচ্ছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কোয়াসার হচ্ছে এমন গ্যালাক্সি, যেখানে তারারা বিন্যস্ত হয়ে আছে অনেক ঘনভাবে, এবং সেখানে একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হচ্ছে হাজার হাজার সুপারনোভা।

যে আলোতে একটি কোয়াসারকে আমরা দেখতে পাই, বিজ্ঞানীরা বলেন, তা বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিল কোটি কোটি বছর আগে। সুতরাং আজ যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাবিশ্বের প্রান্তসীমায়, জ্বলজ্বল করছে, সে তার আজকের রূপ নয়, কোটি-কোটি বছর আগের। আমরা যখন বারোশ কোটি আলোক বছর দূরের কোনো কোয়াসারকে পর্যবেক্ষণ করি, দেখতে পাই তার বারোশ কোটি বছর আগের চেহারাকে। সেটি হয়ত ছিল তার টগবগে তারুণ্য বা ভরা যৌবনের রূপ। এতদিনে হয়ত সে আর বেঁচে নেই: ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে, হয়ত বা গেছে বুড়িয়ে। কিন্তু আকাশে আকাশে কেন এই ব্যাপক আয়োজন, এমন অকারণ আতশবাজি, বস্তু ও শক্তির এমন বিপুল অপব্যয়? রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় নিহিত আছে এই প্রশ্নের উত্তর:

‘বহু যুগযুগান্তের কোন এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।’

অর্থাৎ প্রকৃতির কোটি কোটি বছরের সাধনা, বহু ব্যর্থতা ও বিপুল অপচয়ের পর একদিন এখানে মানুষ নামের এক বুদ্ধিমান সত্তা এসে মহাবিশ্বকে আবিষ্কার করবে বলেই, তার মহিমা উপলব্ধি করবে বলেই যেন আকাশে আকাশে এমন বিপুল আয়োজন, বিরাট আতশবজির খেলা। ■

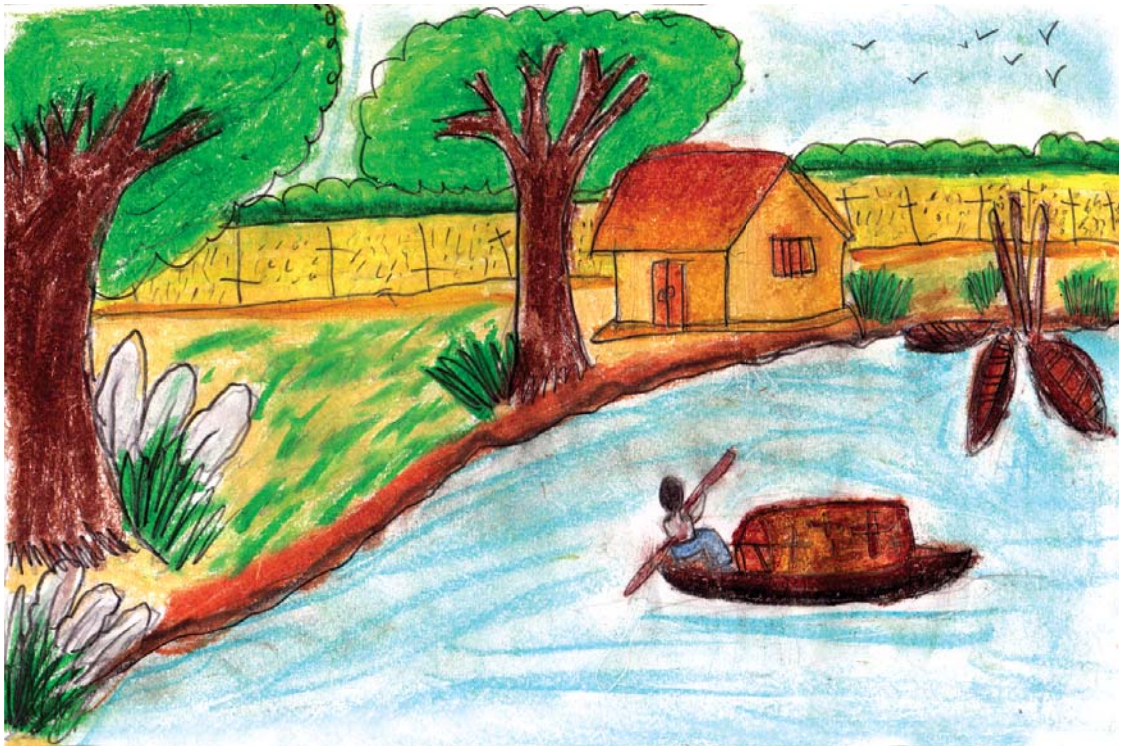

আবু সুফিয়ান লিখন, পঞ্চম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

আমরা সবাই বই পড়তে ভালোবাসি, তাই না বন্ধুরা। বইকে পুস্তক বা গ্রন্থও বলা হয়। গ্রন্থ পাঠ এমন একটি বিষয় যার দ্বারা জ্ঞানের যে অসীম চাহিদা তা মেটানো যায়। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা আজ সফল ব্যক্তিদের তালিকার শীর্ষে। তোমরা কী জানো তাদের সবার সফলতার পেছনে একটি সাধারণ গুণ ছিল? হ্যাঁ, আর তা হলো নিয়মিত বই পাঠ করা। এই বই বা গ্রন্থগুলো একসাথে যেখানে রাখা হয়, তাকে বলা হয় Library বা গ্রন্থাগার।

বন্ধুরা, আমাদের দেশে রয়েছে ছোটো-বড়ো নানান ধরনের গ্রন্থাগার। এর মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। জাতীয় গ্রন্থাগার হচ্ছে সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ গ্রন্থাগার। যা ঐ দেশের সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করে। আর তা জনগণের মধ্যে সরবরাহের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই নানা ধরনের গ্রন্থাগার রয়েছে। কিন্তু সব দেশেরই জাতীয় গ্রন্থাগারটি বিশেষ ধরনের হয়। কারণ, জাতীয় গ্রন্থাগারটি অনেক বড়ো আকৃতির হয়ে থাকে এবং সেখানে সব ধরনের বই পাওয়া যায়। এই গ্রন্থাগার (Library)-কে যে একটি বিশেষ দিনে উদ্‌যাপন করা হয় তাকে বলা হয় 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর। এরপর ২০১৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি প্রথম এ দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এবার তৃতীয়বারের মতো 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২০' উদ্‌যাপিত হয়। এবারের প্রতিপাদ্যটি হলো- 'পড়ব বই গড়ব দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। এ বছর নানা আয়োজনে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। সারা দেশের গ্রন্থাগারগুলোতে ছিল নানা আয়োজন। জাতীয় পর্যায়ে শাহাবাগ-এ অবস্থিত গ্রন্থাগার অধিদপ্তর চত্বর থেকে বের হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

গ্রন্থাগারে নিয়মিত যাওয়ার মাধ্যমে তোমাদের পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধি হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়ার। এই সোনার বাংলা গঠনের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো 'গ্রন্থাগার'। বঙ্গবন্ধুও কিন্তু বই পড়তে অনেক ভালোবাসতেন। তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতেও ছিল গ্রন্থাগার। যা বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ে ছিল ভরপুর। বঙ্গবন্ধুর বইপ্রেম বিষয়টি তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র মধ্যেও প্রকাশিত। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও নিয়মিত বই পাঠ করেন। এছাড়াও তিনি একজন লেখক।

বন্ধুরা, তোমরা বেশি বেশি গ্রন্থাগারে যাবে এবং বই পাঠ করবে। গ্রন্থাগারগুলোতে গেলে হতে পারবে জ্ঞানসমৃদ্ধ একজন সফল মানুষ। জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনে গ্রন্থাগার ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। ■

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

মেজবাউল হক

অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটের নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে গত আসরের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ৩ উইকেটে হারিয়ে এ জয় অর্জন করে লাল-সবুজের ক্রিকেটাররা।

ইতিহাসের হিসেবে বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে ছিল ভারত। কিন্তু ম্যাচের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ প্রমাণ করে দিল সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার দল বাংলাদেশ নয়। ভারতের ব্যাটসম্যানদের নাস্তানাবুদ করে বাংলাদেশের বোলাররা ভারতকে ১৭৭ রানে অলআউট করে জয়ের প্রাথমিক কাজটা করে ফেলে। ভারতকে কঠিন লড়াইয়ের মুখামুখি করে বাংলাদেশ। লড়াই হলো শেষ পর্যন্ত। এরপর রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে ভারতের বোলারদের ধাক্কা খেলেও বাংলাদেশের অধিনায়ক আকবর আলি হার না মানা অপরাজিত ৪৩ রান বাংলাদেশকে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। আর প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ

এবারের আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ১৭ই জানুয়ারি– ৯ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১৩ তম আসর, দ্বিতীয় বারের মতো দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হয় এই আসর। প্রতিযোগিতায় ১৬টি দল ৪টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে খেলে। প্রতি গ্রুপে শীর্ষ দুটি দল প্রতিযোগিতার সুপার লীগ পর্বে খেলে। প্রথম সুপারলীগ সেমি-ফাইনালে ভারত পাকিস্তানকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়। অপরদিকে দ্বিতীয় সুপারলীগের সেমি-ফাইনালে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডকে ৬ উইকেটে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়।

ফাইনালে, ভারত প্রথমে ব্যাট করে ১৭৭ রান তোলে। তবে বাংলাদেশের ইনিংসের সময় বৃষ্টির কারণে ডিএলএস পদ্ধতি অনুসারে বিজয়ের জন্য বাংলাদেশের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪৬ ওভারে ১৭০ রান। বাংলাদেশ ৪২.১ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায় ও ভারতকে তিন উইকেটে হারিয়ে টুর্নামেন্ট জয় করে। এটি আইসিসি ইভেন্টের যে-কোনো স্তরে বাংলাদেশের প্রথম শিরোপা জয়। ■

সোনামণিদের সুন্দর হাসি

অনিক শুভ

দু-তিনটি ফোকলা দাঁতের শিশুর নির্মল হাসি কার না ভালো লাগে? এই হাসি অমলিন রাখতেই শিশুর দাঁতগুলো যেন সুস্থ থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিশুর মুখে প্রথম ওঠা দাঁতগুলো হলো দুধ দাঁত। শিশুর জন্মের ছয় মাস থেকেই এই দাঁত ওঠা শুরু করে। দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে বিশটি দাঁত মুখে জায়গা করে নেয়। প্রথম দিকে দেখা যায় শিশুর দাঁতের যত্নে মা বাবারা খুব একটা গুরুত্ব দেন না। অনেকেরই ধারনা এ দুধ দাঁতগুলোতো থাকছে না। দাঁতগুলো পড়ে গিয়ে যখন নতুন দাঁত উঠবে, তখন বরং যত্ন করা যাবে। দুধ দাঁতের ভালো মন্দের উপর অনেকটাই নির্ভর করে স্থায়ী দাঁতগুলো কেমন হবে তাই সেই ছোট্ট বেলা থেকেই নিতে হবে দাঁতের যত্ন।

শিশুদের দুধ খাওয়ানোর পর ভালভাবে মুখ ধোয়াতে হবে এবং পেট ভরে জল পান করাতে হবে। তাহলে মুখের ভেতর যে সমস্ত খাবার আছে তা ধুয়ে পেটে চলে যাবে এবং হজমে সাহায্য করবে। দুধ খাওয়ানোর পর একটা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো গরম জলে ডুবিয়ে বাচ্চার মুখ ভালোভাবে মুছে দিতে হবে। প্রতিদিন দুইবার এইভাবে করলে বাচ্চার মুখের ভেতরে কোনো খাবার জমে থাকতে পারবেনা। বাচ্চার মুখে কোনো রকম ঘা দেখা দিলে সেই ঘায়ে মধু লাগিয়ে দিতে হবে। তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ঘা শুকিয়ে যাবে।

ছয় মাস থেকে শিশুদের দাঁত উঠতে শুরু করে। এই সময় শিশুদের একরকম মাড়ির সমস্যা দেখা দেয়। মাড়ি ফুলে যায় এবং খুব ব্যথা হয়। মেডিকেটেড লোশন লাগালে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। ছয় থেকে চব্বিশ মাস, শিশুদের যে সময় দুধের দাঁত ওঠে সে সময় নানা সমস্যা দেখা দেয়। যেমন জ্বর, পেট খারাপ, অকারণে কান্না ইত্যাদি। এ সবের জন্য অযথা অ্যান্টিবায়টিক দেওয়া উচিত না। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল সিরাপ ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়ালে উপকার পাওয়া যাবে। মাড়িতে মেডিকেটেড লোশন লাগালে ব্যথা এবং ফোলা কমবে। এই সময় কয়েক রকমের মাড়ির রোগ দেখা যায় যা অনেকদিন ধরে শিশুকে কষ্ট দেয়। এইসব ক্ষেত্রে শিশুদের ক্লোরহেক্সিডিন জাতীয় লোশন বা জেল এবং ভিটামিন সি দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আবার পাঁচ বছরের শিশুদের অন্য রকম সমস্যা দেখা যায়। যাকে বলে প্রাইমারি হারপিক্স সিমপ্লেক্স যা একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। এই সময় শিশুদের মাথা ধরে,

জ্বর হয়, মুখে দানা উঠে, খেতে চায় না। ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের পরামর্শে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সিরাপ, প্যারাসিটামল সিরাপ ক্লোরহেক্সিডিন জাতীয় লোশন লাগালেই উপকার পাওয়া যাবে।

শিশুর ছয় থেকে সাত বছর থেকে সাড়ে এগারো বছর পর্যন্ত সময় কে বলা হয় মিক্সড ডেন্টিশন পিরিয়ড। এই সময় শিশুদের মাড়ির অন্য রকম সমস্যা দেখা দেয়। দুধের দাঁত এই সময় পড়তে থাকে। আবার সেই যায়গাতে নতুন দাঁত উঠে। এছাড়াও মুখের নানা যায়গায় ছোটো ছোটো ঘা দেখা দেয় যাকে বলে অ্যাপথাস আলসার। তখন আশেপাশের মাড়ি ফুলে থাকে, খুব ব্যথা হয়। এই রোগের সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে অনেকে বলে খাবার ঠিক মত হজম না হলে, ঠিকমত ঘুম না হলে অতিরিক্ত চিন্তা করলে এই রোগ হতে পারে। যাই হোক না কেন মেডিকেটেড লোশন বা জেল ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন সি খুব ভালো কাজ দেয় এসময়।

বার বছর বয়স থেকে বাচ্চাদের একটা হরমোনের পরিবর্তন আসে যার কারণে মাড়ির সমস্যা দেখা দিতে পারে। যাকে বলে হরমোনাল জিনজিভাইটিস। মাড়ি লাল হয় এবং নরম হয়ে ফুলে যায়। দাঁত মাজার সময় মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে। এই সময় মাড়ির যত্ন করতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের পরামর্শ নিতে হবে।

দুধদাঁতগুলো ছয় বছর থেকে আট বছরের মধ্যে পড়ে যায়। তারপর স্থায়ী দাঁত ওঠে। তাই শিশুর বয়স দেড় থেকে দুই বছর হলেই তাকে দাঁত ব্রাশ করা শেখাতে হবে। ছয়-সাত বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে সকাল ও রাতে দাঁত ব্রাশ করতে হবে। শিশুর ব্যবহারের উপযোগী নরম ছোটো ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে। ছোটোদের দাঁতের প্রধান শত্রু চকলেট, চুইংগাম। মিষ্টিজাতীয় এসব খাবারে দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মাড়ি ছিদ্র হয়ে যায়। তাই এসব পরিহার করতে হবে। প্রতিবার মিষ্টিজাতীয় খাবার গ্রহণের পর দাঁত পরিষ্কার করা উচিত। দাঁতের যত্নে ফলমূল, শাকসবজি, পর্যাপ্ত পানি ও আঁশযুক্ত খাবার খেতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কেমিক্যাল, সুগন্ধি ও মাউথওয়াশ ব্যবহার না করা ভালো। এতে দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। দুধদাঁত নড়ে গেলে তা টেনে তোলা উচিত নয়। হালকা নড়লে যদি উঠে যায় তো ভালো, নয়তো দন্ত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। শিশুর বয়স এক বছর হলেই তাকে নিয়মিত দাঁতের ডাক্তার দেখাতে হবে। এভাবে বছরে অন্তত দুবার ডাক্তার দেখানো উচিত। ■

বন কাগজ

প্রসেনজিৎ কুমার দে

কাগজ থেকে হবে গাছ আর সে গাছে জন্মাবে ফুল। কী অবাক কাণ্ড, তাই না! হ্যাঁ, কল্পনাটা অলীক মনে হলেও এটাকে সত্য করে দেখিয়েছেন নারায়ণগঞ্জের মাহবুব সুমন। সম্প্রতি তিনি এমন একটি কাগজ উদ্ভাবন করেছেন যেটা ব্যবহারের পর মাটিতে ফেলে দিলে তা থেকে জন্ম নেবে গাছ। কাগজটির নাম দিয়েছেন 'বন কাগজ'। উদ্ভাবিত এ কাগজ তৈরি হয় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের পুরনো বই-খাতা, বিভিন্ন পত্রিকা বা কাগজ থেকে। সুমন পেশায় একজন তড়িৎ প্রকৌশলী। 'শালবৃক্ষ' নামে তার একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার মাধ্যমে তিনি সোলার সিস্টেম, নবায়নযোগ্য শক্তিসহ বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব বিষয় নিয়ে কাজ করেন।

সুমনের তৈরি বন কাগজে দেওয়া থাকে বিভিন্ন ফুল ও সবজির বীজ। এই কাগজ মাটিতে পড়লে উপযুক্ত পরিবেশে অঙ্কুরোদগম হয়। সেখান থেকে পাওয়া যায় ফুল বা ফসল। ১০ থেকে ১১ রকমের সবজি ও ফুলের বন কাগজ সুমন নিজ হাতেই তৈরি করেন। নিজ প্রতিষ্ঠানের ভিজিটিং কার্ড বানানোর চিন্তা থেকেই বন কাগজ তৈরির মূল অনুপ্রেরণা ছিল। এজন্য তিনি বেছে নেন সে সমস্ত কাগজ যা আমরা ব্যবহার করে ফেলে দিই। এই ধরো- পুরনো কাগজ, পত্রিকা, ভিজিটিং কার্ড, ইনভাইটেশন কার্ড ইত্যাদি।

এসব গাছ রোপণের বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। মাটির উপর কাগজটি একটু পানি পেলেই ৮/৯ দিনের মধ্যে গাছ জন্মাবে। বন কাগজ এক বছর পর্যন্ত ভালো থাকে। একটি বন কাগজের ভিতরে থাকা বীজ এক বছর পর্যন্ত সতেজ থাকায় এক বছরের মধ্যে মাটিতে ফেললেই ফসল জন্মাবে এ কাগজ থেকে। যে কাগজগুলো যেখানে-সেখানে পড়ে নষ্ট হয় সেগুলো দিয়েই বন কাগজ তৈরি করা হয়েছে। এই কাগজের বিশেষত্ব হলো যদি আমরা এ কাগজগুলো ব্যবহারের পর ফেলে দিই, এ কাগজ থেকে ১০/১২ দিনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গাছ হবে। সাধারণ কিছু যন্ত্র দিয়ে তৈরি হয় বন কাগজের মণ্ড। সে মণ্ডতে বিশেষ প্রক্রিয়ায়

বীজ দেওয়া হয়। প্রতিটি কাগজের তা তৈরি করতে শ্রম ও সময় লাগে অনেক। পরিবেশবান্ধব বন কাগজ তৈরি করা ইতিমধ্যে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করে নিয়েছে সুমন। অপেক্ষা করছে ক্ষেত্রটিকে আরো বড়ো করার। প্রথম প্রথম কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশে বন কাগজ তৈরির পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে সবাইকে জানানোর চেষ্টা করেন সুমন। অল্প সময়েই বন কাগজের বিষয়টি ফেসবুকে সবাই পছন্দ করেন। সেখান থেকে একজন আমেরিকান বন কাগজের ভিজিটিং কার্ডের জন্য সুমনের সাথে যোগাযোগ করেন। ইতিমধ্যে তাকে বন কাগজের ভিজিটিং কার্ড পাঠানো হয়েছে এবং অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছেন সুমন। এছাড়াও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবিশেষ পরীক্ষামূলকভাবে এই বন-কাগজের তৈরি বিভিন্ন পণ্যের জন্য অর্ডার করেছে। বন কাগজ মূলত উৎপাদনকে লক্ষ্য করে বানানো। বন কাগজ দিয়ে পারমাকালচার মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করে নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে।

সুমন ও তার প্রতিষ্ঠান 'শালবৃক্ষ' কাজ করছে একটি সবুজ পৃথিবীর জন্য। যেখানে মানুষ বাস করবে বনের সাথে একাত্ম হয়ে। বন কাগজ ছাড়াও তিনি তৈরি করেছেন বাঁশের জগ। যার নাম তিউম। এছাড়া ফেলে দেওয়া গৃহস্থালির বর্জ্য থেকে তৈরি করেছেন জৈব সার তৈরির যন্ত্র মাতাল। তরুণদের প্রতি সুমনের আহ্বান, শুধুমাত্র চাকরির পিছনে না ছুটে আমরা এমন কিছু করি যা পরিবেশের উপকারে আসবে। যা থেকে পরিবেশও বাঁচবে এবং নিজেদের কর্মসংস্থানও হবে। পৃথিবী হোক সবুজময় নির্মল ও বাসযোগ্য। ■

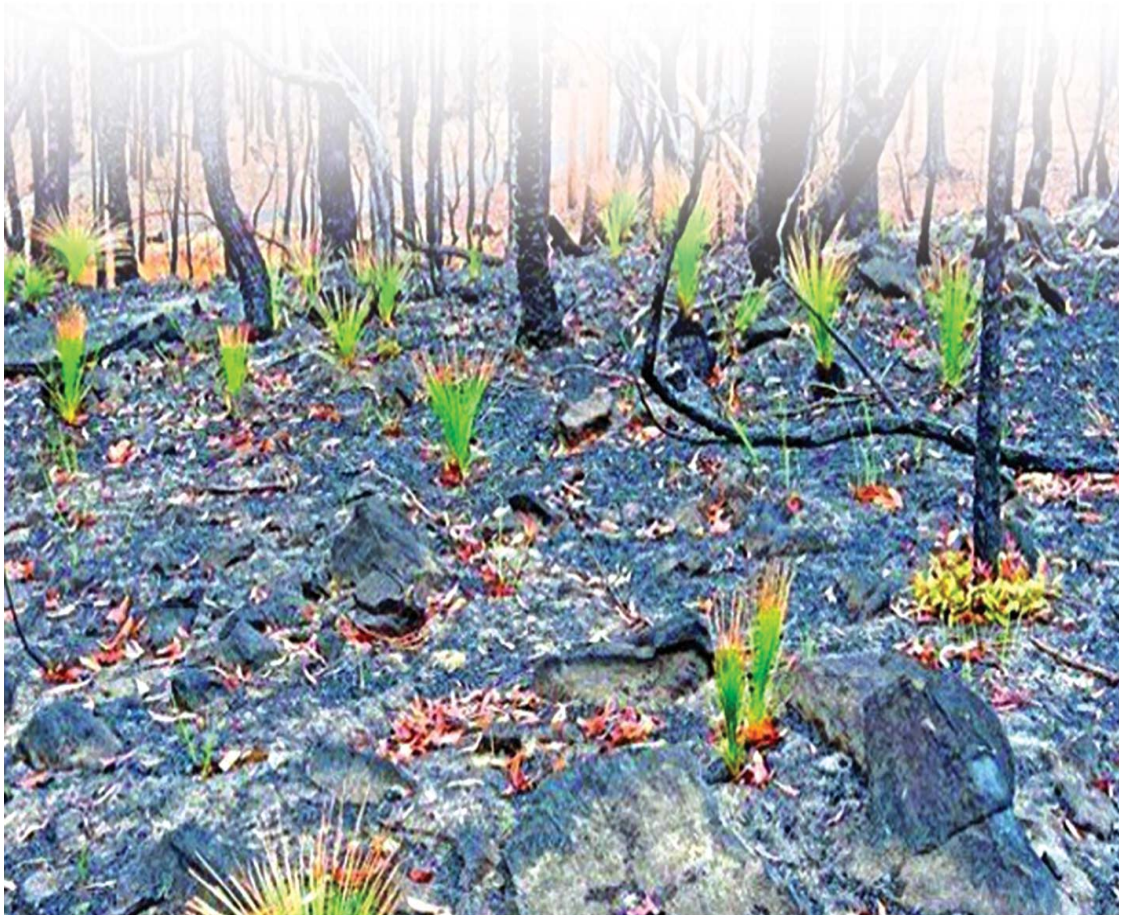

বাজরা

মো. জামাল উদ্দিন

বন্ধুরা, আজ এমন শস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব তা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। শস্যটির নাম হলো বাজরা। এটা ঘাসজাতীয় একটি দানাদার শস্য। এটি গ্লুটেনমুক্ত, ফাইবার শস্যসমৃদ্ধ, পুষ্টিকর এবং সহজে হজমযোগ্য সুপারফুড হিসেবেও বিবেচিত। আকার ও আকৃতির দিক থেকে বার্লির সাথে মিল আছে, তবে এতে ফাইবার আছে বার্লির চেয়েও বেশি। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভারত ও আফ্রিকায় এটির চাষ হয়ে আসছে। বাংলাদেশে নতুন হলেও পুষ্টিগুণের কারণে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।

পুষ্টিগুণ

আটা বা চালের থেকে বাজরায় অনেক বেশি ফাইবার থাকে। এছাড়াও বেশি পরিমাণে প্রোটিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। যদি আমরা তুলনা করতে চাই তাহলে আমরা দেখব আটায় যেখানে আয়রন ৪.৯ মিলিগ্রাম থাকে বাজরায় থাকে ৮ মিলিগ্রাম। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ আটায় থাকে ৭১.২ গ্রাম, বাজরায় থাকে ৬৭.৫ গ্রাম। তাহলে অবশ্যই বুঝতে পেরেছ কোনটা উপকারী।

কী কী উপকারে আসে

ডায়াবেটিকস কমায়: বাজরা ম্যাগনেসিয়ামের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট উৎস। আর ম্যাগনেসিয়াম আছে বলেই ডায়াবেটিসের আশঙ্কা কম হয়। রক্তে গ্লুকোজের সরবরাহও ঠিক থাকে। ম্যাগনেসিয়াম এমন অনেক এনজাইম তৈরি করে যা ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বাজরাকে সঙ্গী করতেই হবে।

হার্ট সুস্থ রাখে: বাজরার একটি উপাদান 'লিগনান্স'। এই লিগনান্স পরিবর্তন হয় কিছু ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে। এরপর তৈরি হয় এনটারোল্যাকটন বলে একটি উপাদান, যা হার্টের জন্য উপকারী। কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্যে করে এই উপাদানটি।

গলব্লাডার স্টোন প্রতিরোধ: সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাজরা গলব্লাডার স্টোন হওয়া প্রতিরোধ করে।

ফল হিসেবে: আমাদের স্বাস্থ্য ধরে রাখার জন্য ফল যে কতটা জরুরি সেটা তো আমরা সবাই জানি। আমাদের প্রত্যেকের দিনের ডায়েটে আমরা তাই ফল রেখেই থাকি। কিন্তু তোমরা জানো কি বাজরার মধ্যে আছে ফলের সমান উপাদান? ফল বা সবজির মধ্যে যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান থাকে, তা সমপরিমাণে বাজরাতেও আছে।

পরিপাকতন্ত্র ভালো রাখে: খাবার ভালোভাবে হজম না হলে অর্থাৎ আমাদের পরিপাকতন্ত্র ঠিক না থাকলে শরীরে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। বাজরা পরিপাকতন্ত্র ভালো রাখতে সাহায্যে করে। ১০০ গ্রাম বাজরা খেলে তার মধ্যে থেকে ৯ গ্রাম ফাইবার পাই যা আমাদের যে-কোনো হজম সমস্যার সমাধান করে দেয়। সহজে খাদ্যকণা পরিপাক করতে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি গ্যাসট্রিক আলসার বা কোলন ক্যানসার প্রতিরোধে করতেও সাহায্য করে।

ক্যানসার প্রতিরোধ: ক্যানসার হওয়ার প্রধান কারণ হলো ফ্রি রেডিক্যাল। বাজরার মধ্যে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আর কোয়ারসেটিন বা সেলেনিয়ামের মতো উপাদান ক্যানসার তৈরি করে যে কোষগুলো তাদের নষ্ট করে দেয়।

অ্যানিমিয়া দূর করে: অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা খুবই সাধারণ একটা রোগ। অনেক সময় ওষুধ খেয়েও এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু বাজরার মধ্যে সেই উপাদান আছে যা অ্যানিমিয়া কমাতে সাহায্যে করে। এতে থাকা ফলিক এসিড, ফোলেট, আয়রন রক্ত বাড়ানোর প্রধান উপাদান।

শরীর সতেজ রাখে: টক্সিন মুক্ত সতেজ শরীর আমাদের সকলেরই লক্ষ্য। তাই আমরা যদি নিয়মিত বাজরার সঙ্গে থাকি তাহলে আমাদের শরীর থেকে টক্সিন আমরা সহজেই দূর করতে পারি। বাজরা নিয়মিত খাবারে রাখলে তার মধ্যে থাকা কোয়ারসেটিন টক্সিন দূর করে। ভিতর থেকে শরীর অনেক সতেজ থাকে।

বাচ্চাদের জন্য: ছয় মাস বয়সের পর থেকে নিয়মিত বাজরা খেলে বাচ্চার হাড় শক্ত হয়। দৈহিক গঠন বৃদ্ধি পায়। ওজন ঠিক থাকে এবং পরিপাকতন্ত্র সবল থাকে। ■

সাইকেলে স্বপ্ন নভেরার

জান্নাতে রোজী

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী ফারজানা মৌসুমী নিজের প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন নারায়ণগঞ্জের নারী সাইকেল চালকদের সংগঠন 'নভেরা'। যে সংগঠনের সাথে এখন যুক্ত হয়েছেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গৃহিণী, শ্রমজীবীসহ প্রায় চার শতাধিক সদস্য। প্রাণ প্রকৃতি রক্ষায় সোচ্চার এসব নারীরা এখন বিনামূল্যে নারীদের সাইকেল চালানোর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছেন স্কুলপড়ুয়া শিশু-কিশোরদের। তবে শুরুর গল্পটা এমন ছিল না নভেরা'র।

তখন ২০১৪ সাল। বন্ধুদের কাছ থেকে সাইকেল চালানো শেখেন হতাশায় নিমজ্জিত ফারজানা চৌধুরী মৌসুমী। সাইকেল চালানো শিখেই যেন প্রাণ শক্তি ফিরে পান। বন্ধ করা পড়াশোনা চালু হয় নতুন উদ্যমে। তখন নারায়ণগঞ্জের নারীদের মধ্যে একা সাইকেল চালাতেন তিনি। ২০১৬ সালে আগ্রহী অন্য মেয়েদের সাইকেল চালানো শেখোনো শুরু করেন মৌসুমী। সবাই মিলে দুটো সাইকেল কিনেন। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে নারী সাইকেল চালকের সংখ্যা। ২০১৭ সালে বন্ধুদের সহযোগিতায় মৌসুমী প্রতিষ্ঠা করেন ' নভেরা' নামের এ সংগঠন।

নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতালের পেছনের সড়কে প্রতিমাসে তিন দিনব্যাপী সাইকেল চালানোর প্রশিক্ষণ দেয় নভেরা। আগ্রহী যে-কোনো নারী অংশ নিতে পারেন এ প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার স্লোগান নিয়ে প্রতি মাসে দুবার সাইকেল ভ্রমণে বের হয় নভেরার সদস্যরা।

সাইকেল মেয়েদের জড়তা ও ভয় দূর করে। নিয়মিত সাইকেল চালানো যেমন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, তেমনি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এই সময়ে সাইকেল হতে পারে পরিবেশ রক্ষার হাতিয়ার। সাইকেল চালিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে যেমন আগ্রহী করছে নভেরা তেমনি আগ্রহী করছে বাধাহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতে।

সুতপা এখন জনপ্রিয়

সুতপা মন্ডল সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার কোদন্ডা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে হয়ে উঠেছে হাজারো শ্রোতার কাছে পরিচিত। সাধাসিধে শান্ত এই মেয়ে খালি গলায় অবলীলায় গেয়ে চলেছে লতা মঙ্গেশকর আর আশা ভোশলের মতো শিল্পীদের গান। ফেসবুকে ওর মধুর কণ্ঠে গাওয়া গান শুনে অনেকেই তাকে 'লতাকণ্ঠী' বলে সম্বোধন করেছে।

একদিন সুতপা মণ্ডলের গান তারই স্কুলের শ্রেণিশিক্ষক মোবাইলে ধারণ করে ফেসবুকে দেয়। আর সাথে সাথে তা আলোড়ন তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকা গানপ্রেমীদের মনে। ভাইরাল হয়ে ওঠার কল্যাণে এক ব্যক্তি সুতপার গানে মুগ্ধ হয়ে ওর লেখাপড়ার জন্য ১ লাখ টাকা উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে। এমনকি ফেসবুক ইউটিউবের গণ্ডি পেরিয়ে মূল ধারার গানের জগতেও এরইমধ্যে নাম লেখা হয়ে গেছে তার। গত দুর্গাপূজায় কবির বকুলের লেখা ও কুমার বিশ্বজিতের সুরে 'মুখোমুখি' নামে একটি মৌলিক গানে কণ্ঠ দিয়েছে সুতপা। ■

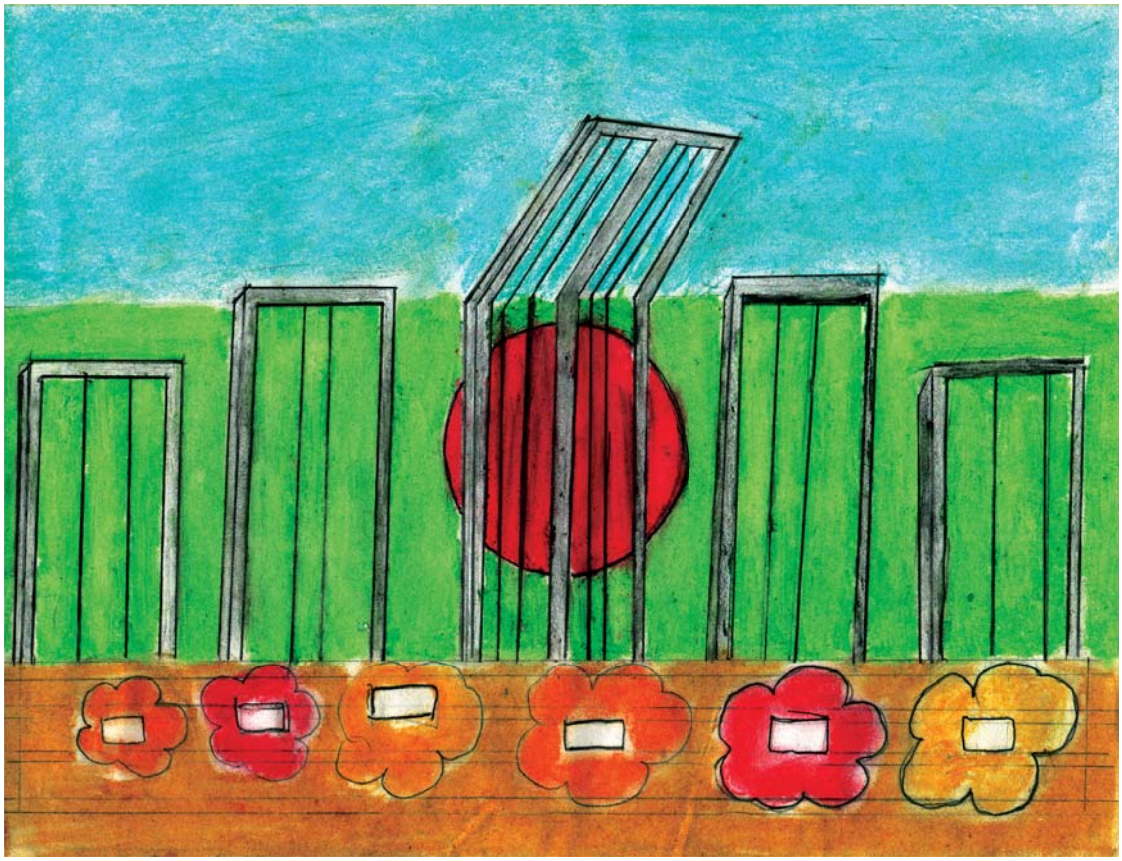

তাসিন মুমস্বাদ, সপ্তম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধাঁ

পাশাপাশি: ১. চীন থেকে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসের নাম, ৫. পৌষ ও মাঘ মাসে মিলে যে কাল হয়, ৬. তাপমাত্রা, ৮. নতুন বছর, ৯. জ্যামিতির একটি পাঠ, ১০. কীর্তি

উপর-নিচ:১. বাংলাদেশের একটি নদী,২. না শীত না গরম, ৩. জীবনকাল, ৪. ২০২০ সালে বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে যে বর্ষ, ৬. উৎপাদিত, ৭.আকৃতি,

১		২		৩			
							৪
		৫					
	৬				৭		
				৮			
৯							
				১০			

ব্রেইনইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

১		২	+		=	৫
+		*		*		+
	/	৩	*		=	২
/		-		-		-
২	+		-	১	=	
=		=		=		=
	-	১	-		=	১

উত্তর

ক	রা	না	ভা	ই	রা	স	
র্ণ		তি		হ			মু
ফু		শী	ত	কা	ল		জি
লী		তো		ল			ব
	উ	ষ্ণ	তা		অ		ব
	ৎ			ন	ব	ব	র্ষ
উ	প	পা	দ্য		য়		
	ন্ন			অ	ব	দা	ন

সমাধান

১	*	২	+	৩	=	৫
+		*		*		+
৬	/	৩	*	১	=	২
/		-		-		-
২	+	৫	-	১	=	৬
=		=		=		=
৪	-	১	-	২	=	১

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধাঁর মতোই এক ধরনের ধাঁধাঁ ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

সংকেত: আনোয়ার পাশা, গুরু, সুনাগরিক, তানোর, পরাগ, জাল, নাগরদোলা, কালিমালিপ্ত, মানিক, গুপ্ত, সজারু, ক্ষতির ইংরেজি শব্দ

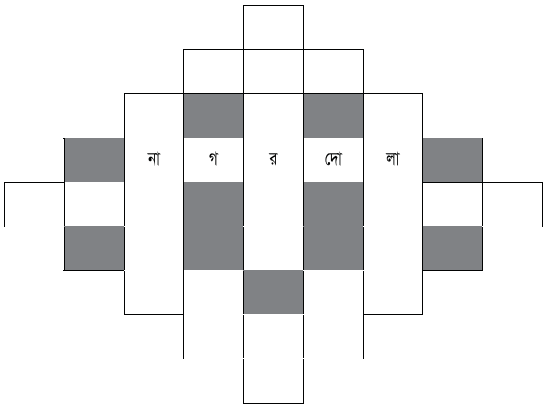

সমাধান:

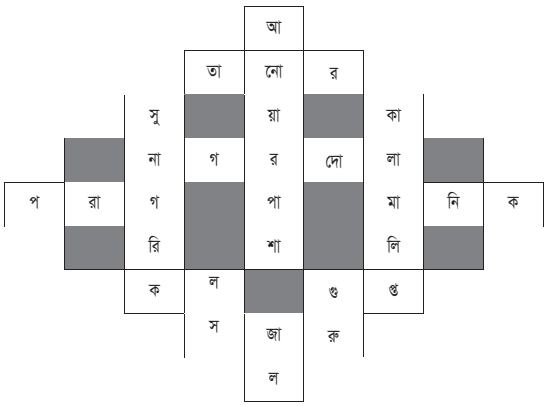

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫		১	১৬		১৮		২৮	
	৩			২০		২৬		
	১০				২২		২৪	
৮		১২		৫৬	৫৫		৩৫	
৬৩			৬০			৩৭		৩৩
	৬৫	৬৬		৫৮			৩৯	
৭৯			৬৮		৫২	৫১		৪১
	৮১	৭৪		৭০		৫০	৪৩	
৭৭			৭২		৪৮			৪৫

সমাধান

৫	৪	১	১৬	১৭	১৮	২৭	২৮	২৯
৬	৩	২	১৫	২০	১৯	২৬	২৫	৩০
৭	১০	১১	১৪	২১	২২	২৩	২৪	৩১
৮	৯	১২	১৩	৫৬	৫৫	৩৬	৩৫	৩২
৬৩	৬২	৬১	৬০	৫৭	৫৪	৩৭	৩৪	৩৩
৬৪	৬৫	৬৬	৫৯	৫৮	৫৩	৩৮	৩৯	৪০
৭৯	৮০	৬৭	৬৮	৬৯	৫২	৫১	৪২	৪১
৭৮	৮১	৭৪	৭৩	৭০	৪৯	৫০	৪৩	৪৪
৭৭	৭৬	৭৫	৭২	৭১	৪৮	৪৭	৪৬	৪৫

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল: editornobarun@dfp.gov.bd

মো. ফারজান আজাদ, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

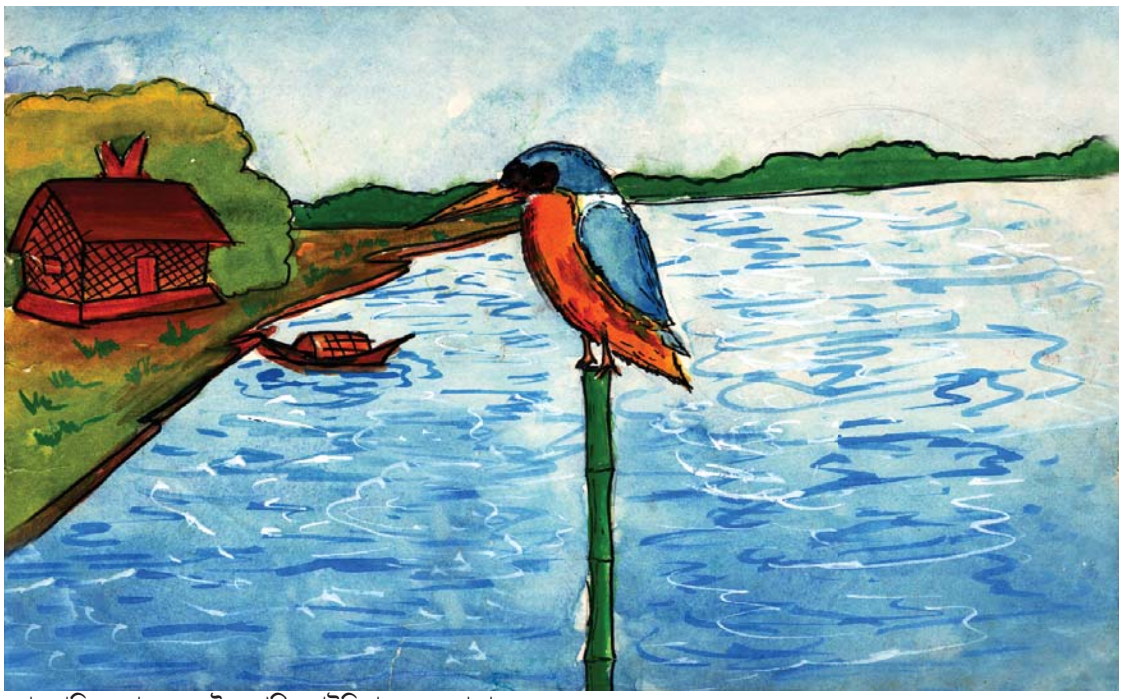

মো. সাজিদ হোসেন, অষ্টম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-44, No-8, February 2020, Tk-20.00

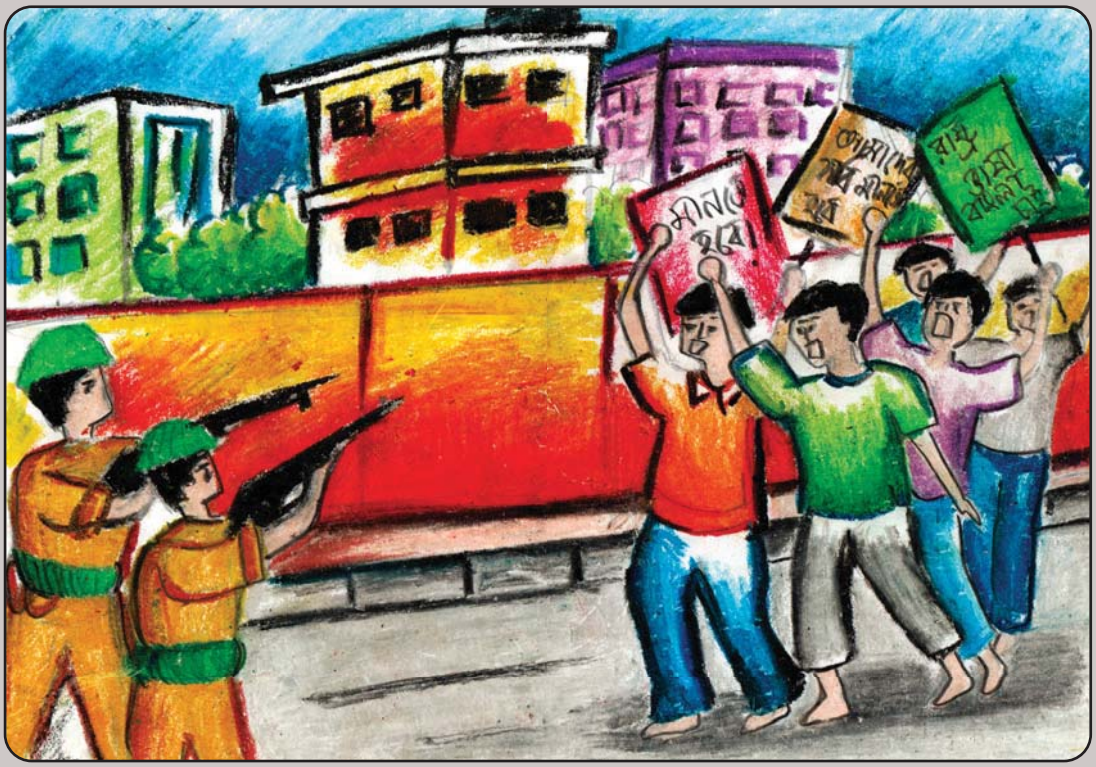

লিলিয়ান ত্রিপুরা, সপ্তম শ্রেণি, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, কক্সবাজার

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা